রাজ্যে গণতন্ত্রের জ্বলন্ত নমুনা

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

মার্চ'১৮ ■ ৪৬তম বর্ষ ■ একাদশ সংখ্যা ■ মূল্য দু'টাকা

মহারাষ্ট্রের লং মার্চে কৃষক রমণীরা

রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

বৃহত্তর সংগ্রামের লক্ষ্যে প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ ও মজবুত সংগঠন

অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী রাজ্য কাউন্সিল-এর চতুর্থ সভা বিগত ২৪-২৫ মার্চ ২০১৮ কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য এবং সহ-সভাপতিত্রয়

সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ

সুনির্মল রায়, গীতা দে এবং প্রশান্ত সাহাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভাপতি কর্তৃক শোকপ্রস্তাব উত্থাপন ও নীরবতা পালনের পরবর্তীতে প্রারম্ভিক প্রস্তাবনায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয়শঙ্কর সিংহ বলেন, আন্তর্জাতিক জাতীয় ও রাজ্যের ক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষ আজ এক দারুণ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। দুনিয়াজুড়ে নিউ লিবারাল পলিসির আক্রমণে বিভিন্ন দেশের জনগণ যেমন আক্রান্ত হচ্ছেন তেমনি দেশে দেশে এর বিরুদ্ধে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে ২০১৪ পরবর্তীতে বিজেপির নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িক হানাহানি দিন দিন বেড়ে চলেছে, একের পর এক বিজেপি শাসিত রাজ্যে সংখ্যালঘু, দলিতদের ওপর আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে, গণতন্ত্রের প্রতিটি ক্ষেত্র আজ আক্রান্ত। ত্রিপুরার সাম্প্রতিক নির্বাচন পরবর্তীতে সেখানে সাধারণ মানুষ খেটে খাওয়া শ্রমজীবী জনগণ আক্রান্ত হচ্ছেন প্রতিদিন। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রেও চলছে উগ্রসাম্প্রদায়িক প্রচার এবং শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতির ঘৃণ্য প্রয়াস। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে ইতিহাস এটাই যে হিটলার-মুসোলিনী শেষ কথা বলেনি, বামপন্থীদের নেতৃত্বে দেশে দেশে মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছেন এবং চূড়ান্ত বিজয় লালফৌজেরই হয়েছিল। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে রাজ্যে রাজ্যে কৃষকেরা পথে নামছেন, প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন নিরন্ন মানুষ। সাম্প্রতিক মহারাষ্ট্রে সারা ভারত কৃষকসভার নেতৃত্বে নাসিক থেকে মুম্বাই পর্যন্ত কয়েক হাজার কৃষক রমণী সহ ৫০ হাজার মানুষের লঙ মার্চ শুধুমাত্র আমাদের

যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী

▶ দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

বকেয়া দাবি দাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে আক্রান্ত নেতা-কর্মীরা

আবারো রাজ্য প্রশাসনের পুলিশ দ্বারা বেনজির আক্রমণের সাক্ষী রইলেন রাজ্য

নবান্নের কর্মসূচী রুখতে পুলিশি তৎপরতা

সরকারী কর্মী-নেতৃত্ব। গত ২০ মার্চ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের দাবি—প্রায় এক লক্ষের কাছাকাছি শূন্যপদে বেকার ছেলেমেয়েদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ করতে হবে, চুক্তিতে কর্মী নিয়োগ করে তাদের সামান্য বেতন দিয়ে কাজ করানো চলবে না, প্রাপ্য বকেয়া মহার্ঘ ভাতা অবিলম্বে প্রদান ও ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ দ্রুত কার্যকর করতে হবে, কর্মীদের অধিকার রক্ষা করতে হবে, হেনস্থা করা চলবে না—এই দাবিগুলি নিয়ে এদিন জেলায় জেলায় টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালিত হয়। পাশাপাশি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক মূল প্রশাসনিক কেন্দ্র নবান্নে যান এই কর্মসূচী প্রতিপালনের জন্য। কিন্তু স্বভাবসিদ্ধভাবেই রাজ্য প্রশাসন নেতৃত্বদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। পুলিশ নেতৃত্ববৃন্দদের ঘিরে ধরে ও ধাক্কা দিয়ে নবান্ন থেকে বের করে দেয়, যা অতীতে কোনোদিন দেখা যায়নি। এই ঘটনায় সমস্ত কর্মচারী সমাজ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। কর্মচারীদের পাওনা টাকা না দিয়ে শাসকদল মেরে দিচ্ছে এবং লুঠতরাজ চালাচ্ছে সারা রাজ্য জুড়ে।

এই দিনই বিকালে কলকাতার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ বলেন—"আমরা কোন অপরাধী বা দুষ্কৃতী নই যে আমাদের প্রতি এই আচরণ করবে পুলিশ। সবার মতামত কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। শূন্যপদ পূরণ না করে বেকার ছেলেমেয়েদের সাথে প্রতারণা করা হচ্ছে। আমরা কোনো দয়ার দান চাইছি না, শুধু পাহাড় প্রমাণ বঞ্চনার সুরাহা চাইছি।" (ছবি অষ্টম পৃষ্ঠায়)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগেও এ বিষয়ে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। লাগাতারভাবে পত্র পাঠানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকেও এবং সর্বশেষ গত ৮ মার্চ মুখ্যমন্ত্রীকেও চিঠি দেওয়া হয়েছে। গত ৭ মার্চ কেন্দ্রীয় সরকার ২ শতাংশ মহার্ঘভাতা বাড়ানোয় রাজ্যের কর্মচারীদের বর্তমান বকেয়া বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৯ শতাংশ। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার অর্থাৎ ধর্মঘটে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় কর্মচারী সংগঠনের পক্ষ থেকে। যে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সারা রাজ্য স্তব্ধ হয়ে যাবে। তারই প্রস্তুতি নিতে হবে সমগ্র কর্মচারী সমাজকে। □

রাজভবনে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বিপুল পরিমাণ মহার্ঘভাতা বকেয়া থাকা, ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ পেশ না হওয়া, লক্ষ লক্ষ শূন্য পদে স্থায়ী নিয়োগ কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সাপেক্ষে বিধিবদ্ধ সুযোগ না দেওয়া ইত্যাদি জরুরি অমীমাংসিত দাবিগুলির দ্রুত মীমাংসা করার প্রশ্নে রাজ্য সরকারের অনমনীয় এবং উপেক্ষার মনোভাবের বিরুদ্ধে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সর্বশেষ গত ৮ মার্চ '১৮ মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করে চিঠি দেয়। দাবিগুলির সুষ্ঠু ও ন্যায্য মীমাংসার প্রশ্নে কোনো সাড়া না পেয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীও সর্বশেষ রাজ্যের রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি করে চিঠি দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। অন্যদিকে রাজ্যপালের সচিবালয় থেকে রাজ্যপালের বিশেষ ব্যস্ততার কারণে রাজ্যপালের প্রতিনিধির সাথে দাবিগুলি নিয়ে আলোচনার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ-এর নেতৃত্বে তিনজনের একটি প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের সচিবের সঙ্গে গত ২৯ মার্চ '১৮ বেলা ৪টার সময় রাজভবনে একটি আলোচনায় মিলিত হন। আলোচনায় বর্তমান মুহূর্তে বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতার দ্রুত নিষ্পত্তি, ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ অবিলম্বে প্রকাশ ও সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনা করে সুপারিশসমূহ

রাজভবনে নেতৃবৃন্দ

কার্যকরী করা, সচিবালয়, অধিকার, কালেক্টরেট, মহকুমা, ব্লক অফিস, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পঞ্চায়েত, পৌরসভার প্রশাসনের ও জরুরী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ শূন্য পদ স্থায়ীভাবে পূরণ, চুক্তিতে নিযুক্ত হাজার হাজার কর্মচারীর স্থায়ীকরণ সাপেক্ষে বিধিবদ্ধ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের দাবিগুলি তুলে ধরা হয়। যুক্তি ও তথ্যের সাথে অন্যান্য রাজ্যের মহার্ঘভাতা ও বেতন কমিশনের সুপারিশসমূহ কার্যকর হওয়ার বাস্তব চিত্র হাজির করা হয়।

রাজ্য সরকার বিভিন্ন খাতে খরচ করলেও সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, বোর্ড, কর্পোরেশন, পঞ্চায়েত পৌরসভার কর্মচারীদের ন্যায্য মহার্ঘভাতা প্রদান করছে না। শুধু তাই নয়, তথ্য দিয়ে একথাও সচিব মহোদয়কে জানানো হয় যে বাজেটে সরকারী কর্মচারী সহ পেনশনারগনসহ অন্যান্যদের জন্য বিধিবদ্ধ বরাদ্দ যা সরকার খরচ করতে দায়বদ্ধ (Committed Expenditure) তাও করছে না। এর ফলে রাজ্য সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, পঞ্চায়েত, পৌরসভাসহ সরকার পোষিত সংস্থাগুলির কর্মচারীদের মধ্যে যে প্রবল অসন্তোষ ও হতাশা তৈরি হয়েছে তাও উল্লেখ করা হয়। সচিব মহোদয় সহানুভূতির সঙ্গে সংগঠনের বক্তব্য শোনেন এবং বিষয়গুলি মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের গোচরে আনবেন বলে জানান। এছাড়া সাধারণ সম্পাদক বিশেষভাবে অনুরোধ করেন মাননীয় রাজ্যপাল ব্যস্ততামুক্ত হলে যাতে মুখোমুখি আলোচনার জন্য সময় দেন সে বিষয়টি দেখার জন্য। প্রতিনিধি দলে সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ ছাড়া ছিলেন সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য ও যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। □

মে দিবসে পঞ্চায়েত ভোটের ঘোষণা

গত ৩১ মার্চ '১৮ শনিবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্য নির্বাচনী কমিশনার আকস্মিকভাবে রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, 'রাজ্যে আগামী ১ মে, ৩ মে ও ৫ মে এই তিন দফায় পঞ্চায়েত ভোট হবে। ৮ মে হবে ভোট গণনা।' ঐতিহাসিক মে দিবসের দিনে পঞ্চায়েত নির্বাচনের শুরুর দিন ঘোষণায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। নির্বা-চনের দিন ঘোষণার অব্য-বহিত পরেই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিজয়শঙ্কর সিংহ প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন ১ মে সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস হিসাবে স্বীকৃত এবং আমাদের রাজ্য, সারা দেশ এবং সমগ্র পৃথিবী জুড়ে শ্রমিক-কর্মচারীরা এই দিনটি মিছিল, সভা, সমাবেশের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর অধিকার রক্ষা ও নতুন অধিকার অর্জনের সংগ্রামী দিন হিসেবে পালন করে। সেই দিনে নির্বাচন ঘোষণা শ্রমিক-কর্মচারীদের অর্জিত অধিকার হরণের শামিল। তাই ১ মে নির্বাচনের দিন বাতিল করার জন্য তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে দাবি জানান। এরপর গত ২ এপ্রিল '১৮ রাজ্য নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলে সংগঠনের পক্ষ থেকে ১ মে '১৮ নির্বাচনের দিন বাতিল করার দাবি জানিয়ে রাজ্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে চিঠি দেওয়া হয়। চিঠিটি মুদ্রিত হলো। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সি আই টি ইউসহ ১১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। এছাড়া গত ২ এপ্রিল '১৮ ১১টি ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মিছিল করে গিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে জোরালো ডেপুটেশন দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান সরকারের শ্রমিক-কর্মচারী বিরোধী অবস্থান এই ঘটনায় বে-আব্রু হয়ে পড়েছে। □

নির্বাচনী আধিকারিককে পত্র

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক
রাজ্য নির্বাচন আয়োগ, পশ্চিমবঙ্গ
তারিখ- ২/৪/২০১৮
মহাশয়,

আপনার দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক রাজ্যের ২০ টি জেলায় আগামী ১, ৩, ও ৫ মে, ২০১৮ অর্থাৎ তিন দফায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হয়েছে।

১ মে, অন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস উপলক্ষ্যে সারা বিশ্বে তথা আমাদের দেশে ও রাজ্যের শ্রমিক কর্মচারীরা ঐ দিনটির গুরুত্ব ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে সভা ও জমায়েতের মধ্য দিয়ে মর্যাদা সহকারে কর্মসূচী পালন করে।

১ মে, অন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসে শ্রমিক কর্মচারীদের ঐতিহাসিক কর্মসূচী পালনের লক্ষ্যে উক্ত দিনে ঘোষিত নির্বাচনের দিনক্ষণ বাতিল ঘোষণা করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদান্তে

(বিজয় শংকর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক

সম্পাদকীয়

সামনে দিন জোর লড়াই

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে একটি দ্বিস্তর বিশিষ্ট সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছিল। দ্বিস্তর অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইনসভা ও প্রশাসন ও প্রাদেশিক আইনসভা ও প্রশাসন। দ্বিস্তরীয় অর্থাৎ একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার সাপেক্ষে, আইন প্রণয়নের ক্ষমতার বিভাজন করে সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক তিনটি তালিকাও সংবিধানে উল্লিখিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা। কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পিত হলো কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, রাজ্য তালিকার অন্তর্গত বিষয়গুলি নিয়ে আইন রচনার জন্য প্রাদেশিক আইনসভাগুলিকে দায়িত্ববদ্ধ করা হলো আর যুগ্ম তালিকায় উল্লিখিত বিষয়গুলিকে নিয়ে আইন প্রণয়নের সুযোগ রাখা হলো কেন্দ্র ও প্রাদেশিক উভয় আইনসভার হাতেই। অবশ্য যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকেই সুবিধাজনক অবস্থানে রাখা হল। কারণ সংবিধানের নির্দেশ হল—যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা যদি ভিন্ন আইন প্রণয়ন করতে চায়, সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনটিই বলবৎ হবে, প্রাদেশিক আইনসভা প্রণীত আইনটি বাতিল বলে গণ্য হবে। এককথায়, আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তে (যেমনটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে), একটি কেন্দ্রীয় ঝোঁক সম্পন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথাই স্বাধীন দেশের সংবিধানে বলা হয়েছিল। পরবর্তী পর্বের অভিজ্ঞতা হল, বারংবার সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে রাজ্য তালিকাভুক্ত বেশ কিছু বিষয়কে যুগ্ম-তালিকায় যুক্ত করে, আইন প্রণয়নে কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষমতাকেই বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল, আর্থ-সামাজিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক- ভাষাগত এবং প্রাকৃতিক বৈচিত্র সম্পন্ন এই দেশে কিন্তু গণতন্ত্রের কাঠামোটিকে দ্বি-স্তরেই সীমাবদ্ধ রাখা হল। গ্রাম বা শহর কেন্দ্রিক স্বায়ত্তশাসনের ধারণা যা গণতন্ত্রের শাখা প্রশাখার বিস্তার ও মানুষের প্রকৃত ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষ জরুরী, তার কোন উল্লেখ সংবিধানে ছিল না। ১৯৪৮ সালের ৪ নভেম্বর ডঃ বি আর আম্বেদকর গণ পরিষদে যে খসড়া সংবিধান পেশ করেছিলেন, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের বাস যে গ্রাম ভারতে (তৎকালীন হিসেব অনুযায়ী মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশের অধিক) সেই গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কে কোন কথা বলা হয়নি। গণপরিষদে এই নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। ডঃ আম্বেদকর গ্রাম-ভারত সম্পর্কে পশ্চিমী চিন্তাবিদ্ মেটকাফের বক্তব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলেছিলেন, ''আঞ্চলিকতা, অজ্ঞতা, সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া গ্রামে কি আছে?'' তবে এইচ. ভি কামাথ সহ বেশ কয়েকজন সদস্য আম্বেদকরের সাথে দ্বিমত পোষণ করে, গ্রামীণ স্বায়ত্ত-শাসনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে চেয়েছিলেন। এই বিতর্ক কিছুটা ফলদায়ী হয়েছিল কারণ, সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles)-র ৪০ নং ধারায় গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসনের প্রসঙ্গটি যুক্ত হয়। যদিও 'নির্দেশমূলক নীতি' সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক বিষয়, এগুলি রূপায়ণের কোন বাধ্যবাধকতা কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক আইনসভার ওপর বর্তায় না। ফলে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দীর্ঘদিন গ্রামীণ স্বায়ত্ত-শাসনের কাঠামোগত কোন সুনির্দিষ্ট অবয়ব বা পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। কিছু বিকল্প কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের না পাওয়ার যন্ত্রণাজনিত ক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হয়েছিল মাত্র। যেমন ১৯৫২ সালে চালু করা হয়েছিল, 'সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী' বা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। ১৯৫৩ সালে লাগু হয় জাতীয় সম্প্রসারণ পরিষেবা। কিন্তু উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া, আমলা নির্ভর এই কর্মসূচীগুলি গণউদ্যোগের অভাবে সফল হয়নি। এই ধরনের কর্মসূচী যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার বিকল্প নয়, তা উপলব্ধি করেই ১৯৫৭ সালে বলবন্ত রাও মেহেতা কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ত্রিস্তর পঞ্চায়েত গঠনের সুপারিশ করে। ১৯৫৮ সালে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের বৈঠকে মেহেতা কমিটির সুপারিশ অনুমোদিত হয় এবং রাজ্যগুলির ওপর ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের কাঠামো গড়ে তোলার দায়িত্ব বর্তায়। কিন্তু রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে কোন রাজ্যই এই দায়িত্ব পালনে উদ্যোগী হয়নি। রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবের কারণটিও ছিল খুব স্পষ্ট। স্বাধীনতার পরেও গ্রামীণ জোতদার-জমিদারেরা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন। ফলে হত-দরিদ্র গ্রামবাসীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত কোন ব্যবস্থা যে তাদের না-পসন্দ্ ছিল, তাতো বলাই বাহুল্য। পরবর্তীকালে অশোক মেহেতা কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন কেরালার প্রথম বামপন্থী সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ। অশোক মেহেতা কমিটিই প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলির নিজস্ব প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুপারিশ করে। ১৯৮৫ সালে গঠিত হয় জি ভি কে রাও কমিটি। ঐ কমিটি পাঁচ বছর অন্তর অর্থ কমিশন গঠনের প্রস্তাব করে এবং অর্থ কমিশনকে জেলা পরিষদকে অর্থ প্রদানের মানদণ্ড নির্ধারণের দায়িত্ব দেয়। বহুচর্চিত সারকারিয়া কমিশনের রিপোর্টেও পঞ্চায়েতের হাতে পর্যাপ্ত প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রদানের কথা বলা হয়। কিন্তু এতগুলি কমিটি ও তাদের বহুবিধ সুপারিশ কার্যত দেশব্যাপী 'অরণ্যে রোদন'-এ পরিণত হয়েছিল। জাতীয় কংগ্রেস সহ গ্রামীণ জোতদার-জমিদার ও ভূ-স্বামীদের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলি গ্রামীণ বাস্তুঘুঘুদের বাসাকে অটুট রাখার জন্য সুপারিশসমূহকে ফাইলবন্দী করে রেখেছিল।

প্রাক্ ১৯৭৭ পর্বে সর্বভারতীয় এই চিত্রের অন্তর্গত ছিল আমাদের রাজ্যও। ''কহিলাম আমি, তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই/ চেয়ে দেখো মোর আছে বড়জোর মরিবার মত ঠাঁই—'' গ্রামীণ উপেনদের এই বিলাপই ছিল গ্রাম বাংলার বাস্তবতা। ফলে গণ উদ্যোগের পঞ্চায়েত পশ্চিমবাংলাতেও ছিল না। যদিও ১৯৭৩ সালে রাজ্যে 'পঞ্চায়েত আইন' গৃহীত হয়েছিল। চারস্তরীয় এই পঞ্চায়েত কাঠামোর (তৃতীয় স্তর অঞ্চল পঞ্চায়েত) গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়া আর কোন স্তরেই নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল না। জোতদার-জমিদারদের মনোনীত সদস্যরাই বিভিন্ন স্তরে আলো করতেন। গ্রামের গরীব মানুষের কোন কাজে লাগত না ঐ পঞ্চায়েত। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকলেও আইন প্রণীত হবার পর ১৯৭৭ পর্যন্ত কোন নির্বাচন হয়নি। ১৯৭৭ সালে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর, ১৯৭৮ সালে প্রথম পঞ্চায়েতের সর্বস্তরের জন্য নির্বাচন হয়। রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি নিজস্ব প্রতীকে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এই নির্বাচন হয়েছিল ১৯৭৩ সালে কংগ্রেস সরকার প্রণীত আইনের ভিত্তিতেই। লক্ষ্য ছিল গ্রামের জমিদার-জোতদার সহ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর স্বার্থকে ধ্বংস করা।

পশ্চিমবাংলার বুকে এই আদর্শ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সাফল্যের নেপথ্যে ছিল 'ভূমি সংস্কারের' কর্মসূচী। ভূমিহীন ও প্রান্তিক দরিদ্র কৃষকদের জমির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে, একে একে গ্রাম বাংলার দরিদ্র জনগণ অর্জন করলেন খাদ্যে স্বনির্ভরতা ও আর্থিক স্থিতি। সৃষ্টি হল শিল্প পণ্যের চাহিদা, অভ্যন্তরীণ বাজার, বৃদ্ধি পেল শিক্ষার চাহিদা। ভূমি সংস্কার ও পঞ্চায়েত একে অপরের পরিপূরকের ভূমিকা পালন করল। আর্থিক স্থিতিশীলতার পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও প্রকৃত অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের পীঠস্থানে পরিণত হল পশ্চিমবাংলা। পরবর্তীকালে ১৯৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯৪ এবং ২০০৩-এ পঞ্চায়েত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে সমাজের সব অংশের মানুষকে যুক্ত করে আরও বেশী জনমুখী প্রশাসন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তপশিলী জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ ছিল এই উদ্যোগের অংশ। ২০১০ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের 'পভার্টি ইরাডিকেশন ইন ইন্ডিয়া বাই ২০১৫' শীর্ষক রিপোর্টে দারিদ্র দূরীকরণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। ১৯৯২ সালে কেন্দ্রে নরসিমহা রাও সরকারের আমলে সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের সমস্ত রাজ্যে যে পঞ্চায়েতী রাজ গড়ে তোলার কথা বলা হয়, তা ছিল পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত মডেলের অনুকরণেই রচিত।

কিন্তু ২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তনের পর, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তার বৈশিষ্ট্য হারাতে শুরু করেছে। ২০১৩ সালের নির্বাচনের সময়, গ্রামের সরকার গঠনে গ্রামের মানুষকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ না দেওয়ার জন্য এবং ভোটদানে বাধা দিতে শুরু হয় নজিরবিহীন সন্ত্রাস। ত্রিস্তর পঞ্চায়েতকে বিরোধীহীন করার লক্ষ্যে নির্বাচিত পঞ্চায়েতকে গায়ের জোরে অথবা প্রলোভন দেখিয়ে দখল করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২০১২ সালে পঞ্চায়েত (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল বিধানসভায় পাশ করানো হয়। যার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় জনসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে। মোট আসন সংরক্ষণের সীমা ৫০% বেঁধে দিয়ে, মহিলাদের সুযোগকে সঙ্কুচিত করা হয়েছে। কারণ বাম আমলে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্যই সংরক্ষিত ছিল ৫০ শতাংশ আসন। এখন চালু হয়েছে সর্বস্তরে যথেচ্ছ লুটের ব্যবস্থা। বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ অর্থ-খরচ হচ্ছে অথচ প্রকল্প লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছচ্ছে না। প্রশ্ন উঠছে টাকাগুলি যাচ্ছে কোথায়? ২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে মোট ৪৭ লক্ষ ভুয়ো জবকার্ড বাতিল করে, তার মধ্যে ১৩ লক্ষ বাতিল হয় শুধু পশ্চিমবঙ্গেই। সাম্প্রতিক অতীতে পঞ্চায়েত মানে ছিল মানুষের ক্ষমতায়ন। বর্তমানে হরেকরকম প্রকল্প ঘোষণা করে (যার মধ্যে রয়েছে পুরোনো প্রকল্প ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের নতুন নামকরণ) বশংবদ উপভোক্তা গোষ্ঠী তৈরী করার চেষ্টা হচ্ছে। প্রকল্পভিত্তিক পরিষেবাকে যুক্ত করা হচ্ছে নির্বাচনী ফলাফলের সাথে। গ্রামীণ সমবায়গুলির গণতান্ত্রিক পরিচালনা পদ্ধতি শিকেয় উঠেছে। নির্বাচন হয় না, চলছে দেদার দুর্নীতি। বিভিন্ন ক্লাবকে অনুদান দেওয়া হচ্ছে উদার হস্তে অথচ ফসলের দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করছে ঋণভারে জর্জরিত কৃষক। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাফল্যের ভিত্তি ছিল ভূমিসংস্কার। অথচ বর্তমানে ভূমি বণ্টন ও পাট্টা দেওয়ার কাজ প্রায় বন্ধ। ৪০ গুণ বা তারও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে জমির মিউটেশন ফি। বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের না দিয়ে আমলাদের হাতে দেওয়া হচ্ছে। এক কথায় আবারও নতুন করে বাস্তুঘুঘু আর স্বার্থন্বেষীদের বাসা হচ্ছে পঞ্চায়েতগুলি।

রাজ্য সরকার পরিচালনায় জনস্বার্থ বিরোধী, স্বৈরতান্ত্রিক ঝোঁক ছাপ ফেলছে পঞ্চায়েত স্তরেও। ফলে রাজ্য পরিস্থিতি পরিবর্তনের কাজটাও শুরু হবে পঞ্চায়েত থেকেই। হিংসা ও সন্ত্রাসকে মোকাবিলা করেই এগোতে হবে। প্রাক্ সাতাত্তর পর্বেও রক্তাক্ত হয়েই এগিয়েছিল পশ্চিমবাংলার প্রগতিশীল গণআন্দোলন। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির কাল এটা। ইতিহাস রচনারও সন্ধিক্ষণ এটাই। চাই শুধু সাহস, সাহস আর দুর্জয় সাহস। □

৯ এপ্রিল '২০১৮

রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেশে নয় গোটা পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের লড়াই-আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। মহারাষ্ট্রের রাজ্য সরকার বাধ্য হয়েছে কৃষকদের দাবীগুলি মেনে নিতে এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রেও আমাদের সংগঠন কর্মচারীর অর্জিত দাবী রক্ষার ক্ষেত্রে এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ওপর নামিয়ে আনা আর্থিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রামে সামিল রয়েছে। বিগত ১৬ নভেম্বর ২০১৭ সংগঠনের পক্ষ থেকে পে কমিশন দপ্তরে অভিযানের সময় প্রশাসনের পক্ষ থেকে তৈরী করা স্টীলের ব্যারিকেড ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে পুলিশের পক্ষ থেকে সংগঠনের নেতৃত্ব সহ কর্মীদের বিরুদ্ধে FIR করা হয়, কিন্তু তৃতীয় কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া সংগ্রাম আন্দোলন দমন করার এই জঘন্য প্রয়াস কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। ধারাবাহিক কর্মসূচীগুলি প্রতিপালিত হয়েছে সমস্ত ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করেই। জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০১৮ গোটা রাজ্যের ব্লকস্তর পর্যন্ত সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সফর সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্লকস্তরের কর্মী-নেতৃত্ব উৎসাহিত হয়েছেন, সাধারণ সদস্যরা নেতৃত্বের সঙ্গে খোলামেলা মত বিনিময় করেছেন। পরবর্তীতে সফরে অংশগ্রহণকারী কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিগত ১০ মার্চ তাদের সফরের অভিজ্ঞতা কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ব্যক্ত করেছেন। ব্লক স্তর পর্যন্ত সফরের অভিজ্ঞতা এবং বিগত কর্মসূচীগুলি প্রতিপালনের অভিজ্ঞতা থেকে এটাই পরিস্ফুট হচ্ছে কর্মচারীরা দারুণ ক্ষুব্ধ, তাঁরা এই বঞ্চনা থেকে, আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইছেন। অমাদের কর্মী-নেতৃত্বকে এই ক্ষোভকে ধারাবাহিক আন্দোলনের রূপ দেওয়ার প্রশ্নে, নূতন নূতন কৌশল উদ্ভাবনে নিজেদেরকে প্রতিনিয়ত সচেষ্ট থাকতে হবে। চুক্তি প্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের সংগঠিত করার প্রশ্নে আমাদের বর্ধিত দায়িত্ব প্রতিপালন করতে হবে। সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে সর্বনিম্ন স্তরে নেমে কাজ করতে হবে। সদস্য নবীকরণকে কর্মসূচী হিসাবে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনার পরবর্তীতে ১৯টি জেলা, ৭টি অঞ্চল এবং পঞ্চায়েত যৌথ কমিটির পক্ষ থেকে 'এ্যাজেণ্ডা নোটস'-কে ভিত্তি করে বক্তব্য উত্থাপিত করা হয়। ২৭ জন বক্তার ২ ঘণ্টা ৪২ মিনিটের আলোচনাকে সূত্রায়িত করে জবাবী বক্তব্যে সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন আজ যখন চারিদিক থেকে শ্রমজীবী মানুষের অংশ হিসাবে আমরা আক্রান্ত হচ্ছি তখন শ্রমিক শ্রেণীর মতাদর্শে বলীয়ান হয়েই আমাদের এই আক্রমণকে প্রতিহত করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে বামপন্থার প্রাসঙ্গিকতা শুধুমাত্র নির্বাচনী ফলাফলের ওপর নির্ভরশীল নয়। মানুষের দাবী নিয়ে প্রতিনিয়ত লাল ঝাণ্ডা ধরে বামপন্থীরা পথে রয়েছে তার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ মহারাষ্ট্রের লং মার্চ। বিশ্বায়নের ভোগবাদী মানসিকতার প্রভাব কর্মচারীর মনোজগত-এ বিভ্রান্তি তৈরী করছে। আমাদের দায়িত্ব হবে এই বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী উপাদানের বিরুদ্ধে এবং ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত চেতনার মানকে শাণিত করে ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তোলা। আমাদের শক্তি আমাদের সদস্য সংখ্যা যা বৃদ্ধির উপাদান রয়েছে। স্ব স্ব সমিতি এবং জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বকে এবিষয়ে পরিকল্পিত উদ্যোগ নিতে হবে। আমাদের কাজ হবে সংগঠনের চলমান প্রক্রিয়াতে কর্মচারীদের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে সামনে রেখে ইউনিট/ব্লক/মহকুমা স্তর থেকে কর্মচারী সমাজের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আন্তরিকতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। বর্তমান পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী বিগত কর্মসূচীগুলির সাফল্যকে সংহত করেই আগামীতে বৃহত্তর সংগ্রামে আমাদের অবতীর্ণ হতে হবে। সভা থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গৃহীত হয়।

আগামী কর্মসূচী

বিগত বিভিন্নমুখীন কর্মসূচীগুলির সার্বিক সাফল্যকে সংহত করে আগামীদিনে সংগঠনের সর্বস্তরে কাঠামোগুলিকে পরিস্থিতি মোকাবিলায় উপযোগী করে তুলে কর্মী-কর্মচারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে আগামীতে অবশ্যম্ভাবী বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতি গড়ে তুলতে সর্বত্র উদ্যোগ গ্রহণ করে সংগঠনকে সার্বিকভাবে প্রস্তুত রাখতে হবে।

(ক) এপ্রিল-মে, ২০১৮ মাস জুড়ে সমিতি, জেলা ও অঞ্চলগুলিতে রক্তদান ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর উদ্যোগ নিতে হবে।

(খ) ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসের কর্মসূচী প্রতি বছরের ন্যায় কেন্দ্রীয়ভাবে কর্মচারী ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। ব্যাপক জমায়েতের উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়া জেলা, অঞ্চল ও সমিতিগুলি অতীতের ন্যায় উক্ত কর্মসূচী উপযুক্ত মর্যাদায় পালন করবে।

(গ) বেশ কিছু সমিতি নিজস্ব দাবিদাওয়া নিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে ও ওয়ার্কিং প্লেসে, প্রকাশ্যে বা হলে সাফল্যের সাথে কর্মসূচী অনুষ্ঠিত করেছে। এখনও যে সব সমিতি কর্মসূচী করেননি তাদের উদ্যোগ নিতে হবে।

(ঘ) সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ষোড়শ জাতীয় সম্মেলন আগামী ৫-৮ এপ্রিল, ২০১৮ চেন্নাই-এ অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) আগামী ২৪-২৫ এপ্রিল, ২০১৮ সারা রাজ্য জুড়ে প্রতিটি দপ্তরে আর্থিক ও অধিকারগত দাবি নিয়ে সারা দিন ধরে ব্যাজ পরিধান ও টিফিনের সময় ধরনা বিক্ষোভের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবে। পরিস্থিতিজনিত কারণে পরবর্তীকালে এই কর্মসূচী আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

(চ) ১৬ মে, ১৯৬৮ রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের যৌথভাবে প্রথম ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে আগামী ১৬ মে, ২০১৮ মৌলালী যুবকেন্দ্রে ছুটির পর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তী সময়ে জেলা ও অঞ্চলে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুরূপ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(ছ) বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় পরিস্থিতি উপযোগী সংগঠন গড়ে তুলতে জেলা ও অঞ্চলগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে (জনপ্রিয় বক্তৃতামালা) আলোচনা সভা করতে হবে। বিষয়গুলি হল (১) সংগঠন সম্পর্কে দলিল; (২) স্বাধীনতা-উত্তরকালে কর্মচারী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি; (৩) বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ও দাবি-দাওয়ার রূপান্তর; (৪) নব্য উদার অর্থনীতি ও মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনে তার প্রভাব; (৫) বুর্জোয়া প্রচার মাধ্যমের বিরুদ্ধে শ্রমিক-র্কচারীদের প্রচার আন্দোলর্ন (৬) মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কর্মচারীদের ঐক্য রক্ষার সংগ্রাম।

দাবিদাওয়া প্রসঙ্গে

গত ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮, বকেয়া মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান, ৬ষ্ঠ পে-কমিশন দ্রুত চালু করা সহ ওয়ার্ক চার্জড কর্মচারীদের নিয়মিত করা, চুক্তিপ্রথায় কর্মচারীদের সব কাজে সম বেতন ও নিয়মিত কর্মচারীদের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা প্রদান, হেলথ স্কীমে চিকিৎসায় বর্ধিত খরচ প্রশাসনিক জটিলতায় বিলের অর্থ (reimbursement) পেতে অযথা বিলম্ব হওয়া, Cash-less-এর সীমা ১ লক্ষ টাকা থেকে ২ লক্ষ টাকা করা সহ একাধিক দাবিতে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয় এবং সাক্ষাৎ করে সংগঠনের পক্ষ থেকে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার জানুয়ারী, ২০১৮ আরো ২ শতাংশ মহার্ঘভাতা ঘোষণা করায় আমাদের রাজ্যে অসংশোধিত বেতনে ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা বর্তমানে বকেয়া। বকেয়া

এর পর ষষ্ঠ পাতায়

পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৮

গণতন্ত্র, স্বাধিকার, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ——পুনরুদ্ধারের লড়াই

কেমন আছেন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত প্রশাসনের কর্মচারীরা!!

- ☐ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের স্থায়ী পদগুলির মধ্যে প্রায় ২১০০০ পদ শূন্য! কোনো স্থায়ী নিয়োগ নেই।
- ☐ পঞ্চায়েতে প্রশাসনেও দম বন্ধকর পরিস্থিতি। প্রশাসনিক সন্ত্রাস, শারীরিক নির্যাতন, কাজের চাপ আর অবমাননাকর পরিস্থিতির চাপ সহ্য করতে না পেরে অনেকে আত্মহত্যার পথ নিচ্ছেন।
- ☐ কোনো ছুটির দিন নেই। ছুটির দিনে কাজ করলেও বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই, ফলে সামাজিক জীবন বরবাদ।
- ☐ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মতোই বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা।
- ☐ ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ ঝুলে রয়েছে।
- ☐ পদোন্নতির সুযোগ-সুবিধা অবরুদ্ধ।
- ☐ নীতিহীন হয়রানিমূলক বদলী!
- ☐ স্থায়ী কর্মচারীদের জন্য নেই 'হেলথ স্কীম'
- ☐ পঞ্চায়েতে কর আদায়কারীসহ সর্বস্তরের অস্থায়ী কর্মচারীদের জন্য নেই 'স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প'।
- ☐ স্থায়ীপদে অস্থায়ী নিয়োগ, নেই কোনো সুষ্ঠু নীতি।
- ☐ অস্থায়ী, চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য নেই কোনো বিধিবদ্ধ সুযোগ-সুবিধা।
- ☐ নেই ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, ধর্মঘটের অধিকার।

এই কি আদর্শ সরকারের নমুনা!!

ত্রিপুরায় বিজেপির বেপরোয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ

৩ মার্চ '১৮ ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরনোর সাথে সাথে বিজেপি ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরার বুকে হিংস্র আক্রমণ নামিয়ে আনে। ট্রেড ইউনিয়ন অফিস দখল, ভাঙচুর, লুঠপাট বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তির উপর উন্মত্ত আক্রমণ, ঘরবাড়ি লুঠ, আগুন লাগানো, মার্কস, লেনিনের মূর্তি ভাঙাসহ সারা ত্রিপুরা জুড়ে ব্যাপক তাণ্ডব সংঘটিত হয়। পশ্চিমবাংলার শাসকদলের কায়দাতেই এই হামলা ভাঙচুর, লুঠপাট, আক্রমণ, এলাকা থেকে উৎখাত প্রভৃতি শুরু হয়েছে। বাদ পড়েননি মাধ্যমিক / উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, রাজ্য সরকারী দপ্তর, রাজ্য সরকারী কর্মচারী এমনকি মহিলারা পর্যন্ত। ত্রিপুরা জুড়ে এই তাণ্ডব, বেপরোয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে গত ৮ মার্চ '১৮ টিফিন বিরতিতে বিক্ষোভ সভা সংগঠিত হয়। ব্লক, মহকুমাসহ সমস্ত জেলা সদরে এই কর্মসূচী ব্যাপকভাবে পালিত হয়। কলকাতার বুকে মহাকরণ, নব মহাকরণ, খাদ্য ভবন, বিকাশভবন, স্বাস্থ্যভবন, ভবানীভবন, বাণিজ্যকর ভবন প্রভৃতি কমপ্লেক্সগুলিতে অফিস বিরতির সময় ব্যাপক সংখ্যায় কর্মচারীরা বিক্ষোভ-সমাবেশে, ধিক্কার মিছিলে মিলিত হন। বাণিজ্যকর ভবনে সাধারণ সম্পাদক বিজয়শঙ্কর সিংহ, বিকাশভবনে যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী, খাদ্যভবনে সহ সম্পাদক মানস দাস, নব-মহাকরণে 'সংগ্রামী হাতিয়ার'-এর সম্পাদক সুমিত ভট্টাচায বক্তব্য রাখেন। সভায় বক্তারা বিজেপি-আইপিএফটি জোটের ঘৃণ্য হামলার বিরুদ্ধে কর্মচারী সমাজকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। বক্তারা জানান ফল প্রকাশের ২/৩ দিনের মধ্যেই ত্রিপুরার বুকে ৪৮টি ইউনিয়ন দপ্তর ভাঙচুর, শ্রমিক সংগঠনের ৮টি দপ্তর পোড়ানো, ১৭০৬টি বাড়িতে হামলা লুঠপাট, ভাঙচুর করা হয়েছে, ৬ মার্চ ধর্মনগরের জেলা হাসপাতালে ঢুকে ব্লাড ব্যাঙ্কের কর্মী অরূপ দেকে নৃশংসভাবে মারধর, পূর্ত দপ্তরের কর্মী সৈকত চক্রবর্তী উপর হিংস্র হামলা সংঘটিত হয়েছে। এই অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচার আক্রমণের প্রতিবাদে সাধারণ সম্পাদক ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার ডাক দেন। ☐

কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে কি অভিজ্ঞতা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ?

- ☐ ৫ম বেতন কমিশনে বেতন বৃদ্ধি ৩০ শতাংশ, ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনে বেতন বৃদ্ধি ৪০ শতাংশ আর ৭ম বেতন কমিশনে বেতন বৃদ্ধি ১৪.২ শতাংশ।
- ☐ শ্রমিক কর্মচারীদের দাবি---ন্যূনতম বেতন---২৬০০০। ৭ম বেতন কমিশনের সুপারিশ লাগু ১৮০০০ টাকা।
- ☐ ফিট-মোট ফর্মুলার দাবি ৩.৭ গুণ। ৭ম বেতন কমিশনের সুপারিশ লাগু ২.৫৭ গুণ।(এর মধ্যে মূল বেতন + ০১.০১.২০১৬-তে প্রাপ্ত ১২৫% মহার্ঘ ভাতা ধার্য্য আছে)
- ☐ বাড়ি ভাড়া ভাতা ছিল ৩০, ২০ ১০ শতাংশ। ৭ম বেতন কমিয়ে করে ২৪, ১৬, ৮ শতাংশ।
- ☐ বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির দাবি ৫ শতাংশ। ৭ম বেতন কমিশনের সুপারিশ লাগু ৩ শতাংশ তাও শর্তাধীন।
- ☐ ন্যূনতম প্রমোশনের দাবি—৫টি অস্বীকার করে ও চির স্বীকৃতি তাও ভেরিগুড পারফরমেন্সের শর্তে।
- ☐ ৫২টি ভাতা বিলোপ।
- ☐ ন্যূনতম পেনশন বৃদ্ধির অস্বীকৃতি
- ☐ নতুন পেনশন আইন বাতিলের দাবি মেনেও প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসা।
- ☐ পেনশনের ক্ষেত্রে বৈষম্য।

আপনি কি পশ্চিমবাংলায় খাল কেটে কুমীর ডেকে আনতে চান!

লুঠ হচ্ছে জনগণের টাকা

নির্মল জেলা

গত ২৯ মার্চ '১৮ বীরভূম ইন্ডোর স্টেডিয়ামে প্রায় ২০-২৫ লক্ষ টাকা খরচ করে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বীরভূম জেলাকে 'নির্মল জেলা' ঘোষণা করল প্রশাসন। দেদার খরচের এই উৎসবের নাম ছিল 'নির্মল উৎসব'।

বাস্তব চিত্রটা কী? সরকারী খরচায় শৌচাগার নির্মাণ হয়েছে ঘরে ঘরে দেখানো হলেও শৌচাগারের দেখা নেই।

গত ডিসেম্বরে নির্মল পঞ্চায়েত ঘোষণা করা হয়েছিল মুরারই ২ নং ব্লকের আমডোলকে। সেই গ্রামের রামচন্দ্রপুর ও ঘোটকাটল দুই এলাকার গ্রামের বহু মানুষ তাদের প্রদেয় ৯০০ টাকা বহু আগে দিয়ে দিলেও তাদের শৌচাগার মেলেনি। এই গ্রামে বসবাসকারী তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি আবু তালেব সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলছেন—"এখনও হলো না, আর হবে কিনা জানি না।"

একই ঘটনা দুবরাজপুর ব্লকের কুমারখাণ্ডা গ্রাম, মহম্মদ বাজারের গ্রাম পঞ্চায়েত ভুতুরাসহ জেলার একধিক গ্রামে।

অথচ নির্মল ঘোষণা মানে বীরভূমের সব শৌচাগারের মাস্টার রোল, এম আই এস এন্ট্রি হয়ে গেছে। অর্থাৎ কাজ সম্পূর্ণ। বরাদ্দ যা মিলেছে তাও খরচ হয়ে গেছে। তাহলে এখনও শৌচাগার না পাওয়া মানুষগুলো যাদের নাম শৌচহীনের তালিকায় উঠে গেছে তাদের জন্য বরাদ্দের টাকা কোথায় গেল? এখানেও উঠছে দুর্নীতির প্রশ্ন। এ প্রশ্ন শুধু বীরভূম নয়, সব জেলাতেই।

ইন্দিরা আবাস যোজনা

গ্রামীন গরিব মানুষের গৃহ নির্মাণের এই প্রকল্পের তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই সেই সুযোগ পাননি। অথচ তাঁদের জন্য বরাদ্দকৃত অংশ গায়েব হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ইন্দিরা আবাস যোজনা বন্ধ হয়ে চালু হয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীন। তার আবার রাজ্যের জন্য নামকরণ করেন মমতা ব্যানার্জী। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে, কারণ এই প্রকল্পে টাকা বেশি। ইন্দিরা আবাস যোজনায় সমতলের জন্য ৭০ হাজার টাকা, পার্বত্য ও দুর্গম এলাকার জন্য ৭৫ হাজার টাকা দেওয়া হতো। নয়া প্রকল্পে এই দুই ক্ষেত্রে যথাক্রমে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা এবং ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও উপভোক্তার তালিকা তৈরি নিয়ে কারচুপির অভিযোগ উঠছে। যার পাওয়ার কথা তিনি পাচ্ছেন না, যার পাওয়ার কথা নয় তিনি পাচ্ছেন।

আরেকটি প্রকল্প গীতাঞ্জলিরও একই অবস্থা। এই প্রকল্প চালু হয় ২০০৯-১০ সালে। এই প্রকল্পের টাকা সরাসরি পৌঁছানোর কথা উপভোক্তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। পুরুলিয়া জেলায় ২০১৫-১৬-তে ২৭১টি চেক জেলা শাসকের দপ্তর থেকে ছাড়ার পর আবার সেখানেই ফিরে এসেছে। টাকার পরিমাণ ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। চেক ফিরে আসার কারণ, যাদের নামে চেক, তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। অভিযোগ এমন অনেক চেক ফিরেও আসেনি। সেই সব ক্ষেত্রে ভুয়ো লোকের নামে কাটা চেক 'যথাযথ' জায়গায় পৌঁছেছিল। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেচে, ২০১১ থেকে ২০১৬—এই সময়ের মধ্যে গীতাঞ্জলী প্রকল্পে ৬৮৭১টি পরিবার প্রথম কিস্তির টাকা পেয়েছে। কিন্তু ব্লকগুলির সঙ্গে হিসাব মেলাতে গিয়ে দেখা গেছে ২৩৬টি পরিবারের গড়মিল। গড়মিলের টাকার অঙ্ক ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। আসলে এর পরিমাণ আরও বেশি, এমনকি বাড়ি বানানোর সময় জমি চুরিও হয়েছে। ঠিক ছিল গীতাঞ্জলির বাড়ি তৈরি হবে ২২.৭০ বর্গমিটার এলাকায়। পুরুলিয়ার প্রায় ৫৯ ভাগ গীতাঞ্জলির বাড়ি তৈরি হয়েছে ১৬.৬৫ থেকে ২০.২৫ বর্গ মিটার এলাকায়। গ্রামবাসীরা এ বিষয়ে প্রশ্ন করলেও বিডিওদের থেকে জবাব মেলেনি। ☐

আনন্দবাজার উবাচ

৬ মার্চ আনন্দবাজার পত্রিকার তিন-এর পাতায় "ভোট আছে, আছে হিংসাও, নেই সেই পঞ্চায়েত" শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে---"সে বামও নেই। সে পঞ্চায়েতও নেই। তৃণমূল জমানায় দ্বিতীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঘোষণা হতেই শুরু হয়েছে হিংসার দাপট। কিন্তু তার মাঝেই প্রশ্ন উঠছে, যে পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি হওয়ার জন্য এত হিংসা, সেই ব্যবস্থার পুরনো গৌরব বা গুরুত্ব কি আর আছে?.. বামফ্রন্ট সরকারের কাজের অন্যতম মাইল ফলক ছিল ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। গোটা দেশে পঞ্চায়েতিরাজ চালু করার সময়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী খোলাখুলি মেনে নিয়েছিলেন, বাংলা এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত। বাম জমানায়... জেলায় জেলায় উন্নয়নের কাজে জেলা পরিষদের আলাদা গুরুত্ব ছিল। সি পি এমের দলীয় স্তরে সিদ্ধান্ত হলেও গ্রাম সংসদে অন্তত সেসব এনে পাশ করানোর রেওয়াজ ছিল। বিমল মিস্ত্রী, অপর্ণা গুপ্ত, ম্যাগদালিনা মুর্মু, অন্নপূর্ণা মুখোপাধ্যায়, উদয় সরকার, রমা বিশ্বাস, নিরঞ্জন সিহি বা বিলাসী বালা সহিসের মতো জেলা সভাধিপতিদের নাম এবং দাপটের কথা জানত লোকে। এখন জেলা সভাধিপতি খবরে আসেন মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে তিরস্কৃত হলে। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শিবিরের একাংশের মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় সরাসরি রাজ্য সরকারই পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করছে ঘরে ঘরে। জেলায় গিয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক বৈঠক করছেন। সঞ্চালনায় থাকছেন জেলাশাসক। জল নেই, চাল নেই বা রাস্তা চাই---সব চাহিদা এবং অভিযোগই উঠে যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর কানে। তিনি কখনও জেলাশাসক, কখনও বিডিওকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছেন। তা হলে পঞ্চায়েতের আর আলাদা গুরুত্ব থাকল কোথায়?...

"শাসকদলের নেতারাই বলছেন... নবান্নই এখন আসল পঞ্চায়েত।"

বামবিরোধী ও পুঁজিবাদের সমর্থক আনন্দবাজার পত্রিকার উপরোক্ত প্রতিবেদনটিতে কার্যত স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, বামফ্রন্ট সরকার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থ চালু করার মধ্য দিয়ে ক্ষমতার যে বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়েছিল, তার চাকাকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে তৃণমূল সরকার পঞ্চায়েতের অধিকার কেড়ে নিয়ে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটিয়েছে।

এই পরিবর্তন শুরু হয়েছিল তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই। ২৬ মার্চ ২০১২-তে একটি আদেশনামা জারি করে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের যাবতীয় ক্ষমতা কেড়ে নেয় তৃণমূল সরকার। যা ছিল বেনজির ঘটনা। শুধু উত্তর ২৪ পরগনা জেলাই নয়, এই অনাচারের শিকার হয়েছিল মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলা পরিষদ। বলা বাহুল্য তিনটি জেলা পরিষদই সেই সময় ছিল বিরোধী দল পরিচালিত।

মুখ্যসচিবের পক্ষ থেকে জারি করা সেদিনের নির্দেশে (১৯৫৯/জি এন / ও / ১/ ৩বি-২/২০১২) অনুসারে, "কার্যকরী ভাবে ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৭৩-র ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত অ্যাক্টের ২১২ ধারা অনুসারে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের টাকায় পরিচালিত যাবতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব জেলা শাসক তথা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের এক্সিকিউটিভ অফিসারকে অর্পণ করা হলো।"

নির্বাচিত প্রতিনিধি, সংস্থাকে অগ্রাহ্য করে মানুষের মতামতকে কার্যত পদদলিত করা এবং বিরোধীদের উৎখাত করার রাজনীতির সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে সেদিন থেকেই।

তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গ্রামোন্নয়নের যাবতীয় দায়িত্ব থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরিয়ে আমলাদের দায়িত্ব দেওয়া শুরু করে গোড়া থেকেই। এমনকি তৎকালীন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ বাধ্য হন মুখ্যমন্ত্রীকে আপত্তি জানিয়ে চিঠি লিখতে। ☐

দেদার বেড়েছে জমির মিউটেশন ফি

কোথাও ৪০ গুণ। কোথাও ১০০ গুণ। কোথাও তারও বেশি—২০০ গুণ। নিঃশব্দে গ্রাম, শহরের মিউটেশন ফী দেদার বাড়িয়ে দিয়েছে বর্তমান সরকার।

রাজ্যের ভূমিমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। ফলে এই সিদ্ধান্ত একান্তই তাঁর। ২০০৫-এ শেষবার মিউনেশন ফী বেড়েছিল রাজ্যে। তাও বেড়েছিল নামমাত্র। বামফ্রন্ট সরকার গ্রাম, শহরের সাধারণ মানুষের উপর বিপুল মিউটেশন ফী চাপানোর বিরোধী ছিল।

এবার কেমন বদল ঘটেছে? ২০০৫-এর নির্দেশিকা অনুসারে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে এক ডেসিমেল কৃষি জমির মিউটেশন করাতে খরচ হতো ১ টাকা। অর্থাৎ এক একরের মিউটেশন ফি ছিল ১০০ টাকা। এখন গ্রামাঞ্চলে এক একর কৃষি জমির মিউটেশন ফি দাঁড়িয়েছে ৪০০০ টাকা। বেড়েছে ৪০ গুণ।

গ্রামাঞ্চলে এখন জমি আছে, যা চাষের কাজে ব্যবহার হয় না। আবার তা কোনও বাণিজ্যিক কাজেও ব্যবহৃত হয় না। এই 'নন-এগ্রিকালচারাল, নন-কমার্শিয়াল' জমির মিউটেশন ফি ২০০৫-এ ছিল ডেসিমেল পিছু ১০ টাকা। অর্থাৎ একর পিছু ১০০০ টাকা। তাকে মমতা ব্যানার্জির সরকার পৌঁছে দিয়েছে ১০,০০০ টাকায়। বেড়েছে দশগুণ। গ্রামাঞ্চলের জমি কিছু ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক কিংবা শিল্পের জন্য ব্যবহৃত হয়। এর প্রবণতা বেড়েছিল রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার বাড়তি গতি আনার পর। ২০০৫-এ এমন সব জমিকে একটি ভাগেই রেখেছিল। সেক্ষেত্রে মিউটেশন ফি ছিল ডেসিমেল পিছু ২০ টাকা। অর্থাৎ একর পিছু ২০০০ টাকা। মমতা ব্যানার্জি এই ক্ষেত্রে দুটি ভাগ করেছেন। তাঁর সরকারের সাম্প্রতিক নির্দেশ অনুসারে, ১০ ডেসিমেল জমি পর্যন্ত একরকম হার। আর তার বেশি হলে আর একরকম। ১০ ডেসিমেল পর্যন্ত বাণিজ্যিক এবং শিল্পের কাজে ব্যবহৃত গ্রামাঞ্চলের জমিতে মিউটেশন ফি ডেসিমেল পিছু ৫০০ টাকা হয়েছে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে দশ ডেসিমেল জমির মিউটেশন ফি আগে ছিল ২০০ টাকা। এখন তা দাঁড়াল ৫০০ টাকা।

আর যদি বাণিজ্যিক এবং শিল্পের কারণে ব্যবহৃত জমির মিউটেশন ফি একর পিছু ২০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান আমলে হয়েছে ১ লক্ষ টাকা। জমি বাড়লে মিউটিশন ফিও বাড়বে। ☐

সংগঠন তহবিল

রাজ্য কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মে-জুন মাসের বেতন থেকে সংগঠন তহবিল সংগ্রহের কর্মসূচী প্রতিপালিত হবে। মোট বেতন ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত ১০০ টাকা, ২০-৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত ১৫০ টাকা এবং ৩০ হাজারের ঊর্ধ্বে ২০০ টাকা। ফ্যামিলি পেনশনারদের ৫০ টাকা।—কেন্দ্রীয় কমিটি

রামের নামে রাজনীতি

সুমিত ভট্টাচার্য

রামায়ণ মহাকাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রীরামচন্দ্র ভারতের এক বিস্তীর্ণ অংশে জনপ্রিয় চরিত্র। তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর হনুমানও বিশেষ জনপ্রিয়। তবে শুধুমাত্র রামচন্দ্রের অনুচর হিসেবেই নয়, পবনপুত্র হনুমানের নিজস্ব ভক্ত গোষ্ঠীও রয়েছে। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ অনুগামীটির ভক্তদল মূলত উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ। বিশেষ করে হিন্দীভাষী অঞ্চলে, ভারতের রাজনীতিতে যা গোবলয় নামে পরিচিত। 'রামায়ণ' বা 'মহাভারত-এর মতো মহাকাব্যগুলি কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একজন ব্যক্তি লিখেছিলেন কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এই বিতর্কে একটা জোরালো অভিমত হলো, দীর্ঘ সময় ধরে এই মহাকাব্যগুলি গড়ে উঠেছে। একাধিক লেখকের ভাষ্য যুক্ত হতে হতে মহাকাব্যগুলির সম্পূর্ণ অবয়ব আত্মপ্রকাশ করেছে। এই মত অনুযায়ী বাল্মিকী নামে কোন একজন ব্যক্তিকে মহাকাব্যকার হিসেবে ভাবাটা কঠিন। কিন্তু একজন বা একাধিক যাই হোক না কেন, বাল্মিকীর রামায়ণে কিন্তু রামচন্দ্রকে একজন মানুষ হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে, দেবতা হিসেবে নয়। তুলসীদাসের রামায়ণেও রামচন্দ্র একজন দয়াবান শাসক। স্বভাবতই রামচন্দ্র যেহেতু দেবতা নন, তাই তাঁর ঘনিষ্ঠতম অনুচরও বাল্মিকী বা তুলসীদাসের বর্ণনায় ঈশ্বরের প্রতিনিধি নন। কিন্তু উত্তর ভারতে সুশাসক ও বীর রামের দেবত্বপ্রাপ্তি হয়েছে। বাদ যায়নি হনুমানও। তাঁর নিজস্ব ফ্যান গোষ্ঠীর কাছে তিনিও ক্রমান্বয়ে দেবতার স্তরে উন্নীত হয়েছেন। এমনকি কখনও কখনও মনে হয় তার অলৌকিক কাণ্ডকারখানা ঘটানোর ক্ষমতা বোধহয় তার গুরু রামচন্দ্রের থেকেও বেশি। দূরদর্শনের প্রাইম টাইমে বিজ্ঞাপনের দৌলতে আমরা জানতে পারছি সংসারে অশান্তি, চাকরি না পাওয়া থেকে শুরু করে ক্যান্সার রোগের অব্যর্থ ওষুধ হলো 'হনুমান চালিসা'। কিন্তু একথা নিশ্চিত রামচন্দ্র বা হনুমানকে দেবতার আসনে বসিয়ে পুজোর নামে মাতামাতিটা হিন্দীভাষী উত্তর ভারতেই বেশি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে শিব, দুর্গা, কালি, লক্ষ্মী, সরস্বতীর তুলনায় রামচন্দ্র বা হনুমানের জনপ্রিয়তা অনেকটাই কম। দূরদর্শনে রামানন্দ সাগরের 'রামায়ণ' সিরিয়াল প্রবল জনপ্রিয় হলেও, বাঙালীর সনাতন দেবতাদের আসন তারা টলাতে পারেনি। তাই এযাবৎকাল 'রামনবমী' বা 'হনুমান জয়ন্তী' রাজ্যের ইতি-উতি কোথাও কোথাও পালিত হলেও, তেমন হৈ চৈ কখনোই দেখা যায়নি।

কিন্তু হঠাৎ করেই বছর দুয়েক ধরে রামনবমী ও হনুমান জয়ন্তী পালনের ধুম পড়ে গেছে। এবং লক্ষণীয় বিষয় হলো কোন ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সংস্থার উদ্যোগে এইসব কাণ্ডকারখানা ঘটছে না। কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক দুটি রাজনৈতিক দলের ব্যবস্থাপনায় রামচন্দ্র ও হনুমানের কিছু ভক্তবৃন্দ রাস্তায় নেমে পড়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির 'হিন্দুত্ববাদী' রাজনীতির অন্যতম উপাদান হিসেবে 'রামচন্দ্র' বহুদিন ধরেই রয়েছেন। রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ নামক অনৈতিহাসিক বিতর্ককে কেন্দ্র করে বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং দেশব্যাপী দাঙ্গা সংগঠিত করার অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলির কথা আমরা ভুলে যাইনি। ফলে রামচন্দ্রকে সামনে রেখে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির কৌশলটি হিন্দুত্ববাদীদের পুরোনো কৌশল। যদিও বিজেপি এবং তাদের পরিচালক আর এস এস যে বেদকে এদেশের সমস্ত জ্ঞানের আধার হিসেবে দাবি করে, সেই বেদে কিন্তু রামচন্দ্র নামে কোন চরিত্রের উল্লেখ নেই। স্বভাবতই হনুমানজীও সেখানে ঠাঁই পায়নি। এতদ্‌সত্ত্বেও এমন একটি অবৈদিক চরিত্রকে নিয়ে আর এস এস ও বিজেপির আহ্লাদী আস্ফালনের কারণই হলো, যা আগেই বলা হয়েছে, রামায়ণের জনপ্রিয়তা। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, ভারতের যে যে অঞ্চলে রামায়ণ তথা রামচন্দ্র ও হনুমানের জনপ্রিয়তা বেশী, বিজেপির বা আর এস এসের আদি শক্তিকেন্দ্র সেই এলাকাগুলিই। এখন কেন্দ্রে ক্ষমতা দখলের সুবাদে অন্যান্য এলাকাতেও ডালপালার বিস্তার ঘটাতে চাইছে। লক্ষ্য আদি অকৃত্রিম ক্ষমতা দখল। এই লক্ষ্যে এগোনোর জন্য যে এলাকায় যা ফলদায়ী হতে পারে তাকেই ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন খাঁটি ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিনিধি আর এস এস ও বিজেপি, দলিত সমাজের সমর্থন আদায়ের জন্য আম্বেদকর ভজনা শুরু করেছে। অথচ ডঃ আম্বেদকরের জীবন দর্শন ছিল, আর এস এস-র আদর্শগত অবস্থানের ঠিক বিপরীত। আমাদের রাজ্যেও শাখাপ্রশাখা বিস্তারের জন্য প্রথমে বিবেকানন্দকে ব্যবহারের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু বিবেকানন্দের বক্তব্যের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বুদ্ধিজীবী মহলের বিরোধিতার মুখোমুখি হওয়ায় (অবশ্য তার মানে এটা নয় যে, তারা এছ চেষ্টা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছে), নতুন অস্ত্র হিসেবে বাজারে আনা হয়েছে রামচন্দ্র ও হনুমানকে। কিন্তু এরাই কেন? বাঙালীর তো বারো মাসে তেরো পার্বণ। দেবতারও অভাব নেই। তাহলে উত্তর ভারতের হিন্দী বলয় থেকে রাম ও হনুমানকে আমদানি করা হলো কেন? শিব, দুর্গা বা কালির মতো দেবতাদের দিয়ে কাজ হলো না? এর দুটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, শিব, দুর্গা, কালি ইত্যাদি দেবতার পুজো পদ্ধতি সম্পর্কে বাংলার মানুষ পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল। সেখানে নতুন করে কোনো পদ্ধতি চালু করা এবং তাতে মানুষকে অংশগ্রহণ করনো কঠিন। যেমন পুরাণের ভাষ্য অনুযায়ী শিব বদমেজাজী দেবতা। ক্ষেপে গিয়ে তাণ্ডবনৃত্য তার স্বভাবজাত। তুলনায় রামচন্দ্র অনেক শান্ত, ধীর, স্থির। বিনা প্রয়োজনে অস্ত্রের ব্যবহার করেছেন বলে রামায়ণে শোনা যায়নি। তা সত্ত্বেও শিব পুজোর দিনে অস্ত্র মিছিল করবে বলে মানুষকে রাস্তায় নামানো কঠিন। কারণ ঘরে ঘরে মহিলারা শিবপুজোর দিনে শিবলিঙ্গের মাথায় উপোস করে জল ঢালার পদ্ধতিতেই অভ্যস্ত। সেদিক থেকে রামপুজোর কোনো ধারণা বাঙালীর মধ্যে নেই। রাম-সীতা, হনুমানের বাঁধানো ছবি অনেক বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো থাকতে পারে। কিন্তু 'তের পার্বণে' রামের সাধারণভাবে ঠাঁই নেই।

দ্বিতীয়ত, রামপুজো অজানা বিষয় হলেও রাম এবং রামায়ণ অজানা বিষয় নয়। অতীতে সন্ধ্যাবেলায় রামায়ণ পড়ার চল অনেক পরিবারেই ছিল। ফলে জানা-অজানার ছায়াপথে থাকা একটা চরিত্রকে লাইমলাইটে এনে উন্মাদনা তৈরি করা অনেকটা সহজ। এবং তাই করা হলো। অস্ত্র হাতে নামিয়ে দেওয়া হলো শিশুসহ সাধারণ মানুষকে। এখানেই শেষ নয়, রাম পুজোর মন্ত্র হলো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে চোখা চোখা শ্লোগান এবং সাম্প্রদায়িক হানাহানির পরিবেশ সৃষ্টি। এক কথায় রামকে ব্যবহার করা হলো রাজনৈতিক স্বার্থে। একটি রাজনৈতিক শক্তি যখন, মানুষের ধর্ম বিশ্বাস বা মনের কোণে জমে থাকা অনুভূতিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে, তখন এ রাজ্যের শাসক দলের ভূমিকা কী? তারা কি বিজেপির ধর্মমিশ্রিত রাজনীতির মুখোশ খুলে দিতে তৎপর? না, বিস্ময়ের সাথে দেখা গেল, তাঁরা একাজ তো করলেনই না, উল্টে একই পথের পথিক হলেন! তারাও মানুষের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে মিছিলে হাঁটলেন সেই রামেরই নামে। অথচ এই দলেরই নেত্রী সারা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি নাকি বিজেপি বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ ফেডারেল ফ্রন্ট গঠন করবেন। আসলে রাজ্যে ধর্মীয় মেরুকরণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, সেই প্রক্রিয়ায় রাজ্যের শাসকদল শুরুতে সংখ্যালঘু মৌলবাদীদের তোষণ করে, সংখ্যালঘু ভোট সংহত করতে সচেষ্ট ছিল। পরে মনে হয়েছে, আরে এটা করতে গিয়ে যদি সংখ্যাগুরু ভোট পুরোটা ফস্কে যায়? তাই তড়িঘড়ি শুরু হয়েছে রামভক্ত সাজার তৎপরতা। আসলে এটি প্রতিযোগিতা মূলক সাম্প্রদায়িকতা। যার মধ্যে ধর্মের ছিটেফোঁটা নেই, আছে রাজনৈতিক অভিসন্ধি। একে সমূলে বিনাশ করতে না পারলে, রাজ্য জুড়ে আগুন লাগতে দেরী হবে না। □

পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৮

গণতন্ত্র, স্বাধিকার, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ——পুনরুদ্ধারের লড়াই

কেমন ছিল গ্রামবাংলা

১৯৭৮-এর আগে কী পরিস্থিতি ছিল গ্রাম বাংলায়? ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮ তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রর বাজেট ভাষণের একাংশ (বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে) পড়লেই বেশ খানিকটা স্পষ্ট হবে সেই সময়কার গ্রামবাংলার অবস্থা। অশোক মিত্র বলেছেন বিধানসভায়—রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে খেতমজুর প্রায় ৪০ লক্ষ। তাদের মাথাপিছু দৈনিক রোজগার ৩৫ পয়সা। ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট "কাজের বদলে খাদ্য" প্রকল্প চালু করে। সরকারী রিপোর্ট বলছে ১৯৭৭-র সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর—এই দুমাসে ঐ প্রকল্পে রাজ্য সরকার ৬৯ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭৭টি শ্রম দিবস তৈরি করেছিল। মজুরি বাবদ ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ব্যয় করেছিল। দেওয়া হয়েছিল ২৪ হাজার ৮০৪ টন গম। সর্বনিম্ন শ্রমদিবস সৃষ্টি করেছিল অবিভক্ত ২৪ পরগনায়।

বদলে গেছিল চিত্রটা

দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক ২০১০-এ পভার্টি ইরাডিকেশন ইন ইন্ডিয়া বাই ২০১৫, রুরাল হাউসহোল্ড সেন্টার স্ট্র্যাটেজি পেপার' শিরনামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের এই মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের শিশির অধিকারী। সেই রিপোর্ট বলছে—১৯৭৩ সালে দেশে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩২ কোটি ১৩ লক্ষ। এর মধ্যে ২৬ কোটি ১৩ লক্ষ জন গ্রামে থাকতেন। দেশের দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী গ্রামবাসীদের ৭৬.২ শতাংশ ৯টি রাজ্যে থাকতেন। এই রাজ্যগুলি হলো উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ।

কেন্দ্রের ওই রিপোর্টে ফুটে উঠেছে রাজ্যের অগ্রগতির কাহিনী। ওই রিপোর্ট বলছে—১৯৭৩ থেকে ২০০৫, এই সময়ে এই রাজ্যে দারিদ্র কমেছে। ১৯৭৩-৭৪ সালে এই রাজ্যের গ্রামবাসীদের ২ কোটি ৫৭ লক্ষ ৯৬ হাজার জন দারিদ্রসীমার নিচে বাস করতেন। দেশের মোট গ্রামবাসীদের তাঁরা ছিলেন ৯.৯ শতাংশ। ২০০৫-এর মার্চ পর্যন্ত পরিসংখ্যান বলছে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি সত্ত্বেও এই রাজ্যে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী গ্রামবাসীর সংখ্যা ১ কোটি ৭৩ লক্ষ ২২ হাজার। সারা দেশের গ্রামবাসীদের মধ্যে তাঁরা ৭.৮ শতাংশ। অথচ এই একই সময়ে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশাসহ প্রায় প্রত্যেক রাজ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। সরল পাটিগণিত বলছে—একই সময় সারা দেশে দারিদ্র কমেছে ৬ কোটির কিছু বেশি মানুষের। শুধু পশ্চিমবঙ্গে কমেছে প্রায় ৮৫ লক্ষ। এরই ফলস্বরূপ পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় গরিব, পিছিয়ে থাকা মানুষের অংশগ্রহণও বেড়েছিল।

বিকেন্দ্রীকৃত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ও ভূমিসংস্কারের সুফল

২০০৭-এ জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ৬১তম রাউন্ডের ফলাফল প্রকাশ করে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো। তাতে দেখা যায়—১৯৭৩-৭৪ সালে দেশের গ্রামবাসীদের ৫৬.৪ শতাংশ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করতেন। পশ্চিমবঙ্গে এই হার ছিল ৭৩.২ শতাংশ। ১৯৭৩ থেকে ২০০৫-এর মার্চ পর্যন্ত দেশে সবচেয়ে দারিদ্র কমেছে কেরলে। দ্বিতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গ।

১৯৯৪-এর সাহা-স্বামীনাথনের রিপোর্ট বলছে ১৯৮১-৮২, এই ১০ বছরে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য শস্যের উৎপাদন বেড়েছে ৬.৯ শতাংশ। ধারে কাছে কেরল ছাড়া আর কোনো রাজ্য নেই। বলাবাহুল্য কৃষি সংস্কার রাজ্যে অনেক মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়েছে। যা একইসাথে উৎপাদন ও চাহিদা দুটিই বৃদ্ধি করেছে। কারণ সারা দেশে যেখানে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের হাতে মোট জমির মাত্র ৪৩ শতাংশ রয়েছে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ৮৪ শতাংশ জমির মালিক ঐ অংশের কৃষকরা। এসবের সম্মিলিত ফলাফল রাজ্যে ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে আম-জনতার।

ভূমি সংস্কার ও ত্রিস্তর পঞ্চায়েত এই অভূতপূর্ব অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। □

অগ্রগতির অন্যতম ভিত্তি ছিল ভূমি সংস্কার

১৯৭৭ সালে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে ৩৪ বছরে প্রায় ১৪ লক্ষ ৪ হাজার ৯১ একরের বেশি জমি খাস হয়েছে। তার মধ্যে কৃষিযোগ্য জমি ১৩ লক্ষ ১৪ হাজারের বেশি। কৃষি ও কৃষিযোগ্য মিলে সারা দেশে খাস হয়েছে ৬৯ লক্ষ ৩ হাজার ৯০৪ একর জমি। অর্থাৎ সারা দেশের ২০ শতাংশের বেশি জমি খাস হয়েছে এই রাজ্যে। অথচ সারা দেশে কৃষিজমির মাত্র ৩ শতাংশের অধিকারী পশ্চিমবঙ্গ। জমিদারদের মামলার কারণে মূলত আদালতে বিচারাধীন বলে বিলি করা যায় নি প্রায় ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪৯৫ একর জমির পাট্টা। শুধু ২০০৮-এর সেপ্টেম্বরের হিসেবে সারা দেশে ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে জমি বণ্টিত হয়েছে ৫১ লক্ষ ৮১৭ একর। সেই জায়গায় রাজ্যে ঐ সময়ে বণ্টিত হয়েছে ১১ লক্ষ ২৪ হাজার ১৪২ একর। সারা দেশের ৫৪ শতাংশের বেশি পাট্টাদার এই রাজ্যে থাকেন। তাঁদের সংখ্যা ২৯ লক্ষ ৮৫ হাজারের বেশি। এদের মধ্যে তপশিলী জাতিভুক্ত মানুষ প্রায় ১১ লক্ষ ১০ হাজার। আদিবাসীদের মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ ৩৮ হাজার জন পেয়েছেন পাট্টা। এই রাজ্যে তপশিলী জাতি ও আদিবাসীরা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ। কিন্তু ভূমিসংস্কারের ফলে বিলি হওয়া পাট্টার ৬৫ শতাংশ পেয়েছেন তপশিলী জাতি ও আদিবাসী অংশের মানুষ।

অসংরক্ষিত অংশের ২৭ শতাংশ সংখ্যালঘু হলেও বণ্টিত জমির ৩৬.২৪ শতাংশ পাট্টা পেয়েছেন সংখ্যালঘুরাই। প্রায় ৪ লক্ষ ৯০ হাজার সংখ্যালঘু পাট্টা পেয়েছেন।

অধিকার অর্জন করেছেন মহিলারাও। রাজ্যে যৌথ পাট্টার অধিকারী হয়েছেন ৬ লক্ষ ৩ হাজার ৯৮৭টি পরিবার। অর্থাৎ পরিবারের জমিতে মহিলা-পুরুষের সমান অধিকার। আবার স্বামীর মৃত্যু হলে জমির অধিকারী হন স্ত্রীরাই। কিছু ক্ষেত্রে এমনও ঘটেছে। এছাড়াও ২০০৮-এর সেপ্টেম্বরের এক হিসাবে দেখা যায় রাজ্যের ১ লক্ষ ৬০ হাজার ৮৩৭ জন মহিলা একক ভাবেই জমির মালিক। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৬২ হাজারের বেশি। সব মিলিয়ে রাজ্যে বর্ধিত মোট জমির প্রায় ৩০ শতাংশের অধিকারী মহিলারাই।

❑ ভূমি সংস্কারের কাজ আরও সংহত করতে "চাষ ও বসবাসের ভূমিদান প্রকল্প" কার্যকর করেছিল সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার। দেশে প্রথম এরকম উদ্যোগ। খেতমজুর, গ্রামীণ কারিগর ও মৎস্যজীবীদের ৫ কাঠা পর্যন্ত জমি দেওয়া হয়েছে বিনামূল্যে। এই কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য ইচ্ছুক জমির মালিকদের কাছ থেকে বাজার দরের চেয়ে ২৫ শতাংশ বেশি দাম দিয়ে সরকার জমি কিনেছে। প্রায় ২ লক্ষ পরিবার এই প্রকল্পে উপকৃত হন।

❑ তাছাড়া বামফ্রন্ট সরকার বনাধিকার আইন ২০০৬ অনুযায়ী প্রায় ২৭ হাজার আদিবাসী পরিবারকে পাট্টা দেয়।

❑ একদিকে ভূমি সংস্কার অন্যদিকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ—এই দুই গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে ব্যবহার করেই ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে শস্য চাষের নিবিড়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল রাজ্যে। ১৯৯২-৯৩ সালে কৃষি চাষের নিবিড়তা ছিল ১৫৫ শতাংশ। ২০১০ সালে তা দাঁড়ায় ১৯২ শতাংশে। এক্ষেত্রে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে ছিল পশ্চিমবঙ্গ।

❑ রাজ্যে মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৭৬-৭৭ সালে ছিল ৭৪ লক্ষ টন। ২০১০ সালে তা পৌঁছায় ১৭০ লক্ষ টনে।

❑ ১৯৭৭ সালের আগে খাদ্যশস্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ ছিল ঘাটতি রাজ্য। সেই পশ্চিমবঙ্গ চাল উৎপাদনে দেশের মধ্যে প্রথম হয় বামফ্রন্ট সরকারের সময়েই। বছরে গড়ে চাল উৎপাদিত হয় ১৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৯৭৭-৭৮ সালের তুলনায় ৯৮ শতাংশ বেশি।

❑ পাট উৎপাদনেও পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে প্রথম হয়। বছরে গড়ে ৭৮৪২.৬ টন পাট এ

▶ সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

নবম পঞ্চায়েত নির্বাচনের গুরুত্ব ও আমাদের করণীয়

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়েছে। মোট তিন দফায় এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ১ মে রাজ্যের প্রধানত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে (মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম বাদে), ৩ মে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম এবং ৫ মে উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলায় ভোটগ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা বাদে ২০টি জেলার ৫ কোটি ৮৩ লক্ষ ভোটার এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ৪৩ হাজার ৬৭টি এবং বুথের সংখ্যা ৫৮ হাজার ৪৬৭টি। মোট ৫৬ হাজার ৭৪৬টি আসনের মধ্যে জিলা পরিষদের আসনসংখ্যা ৮২৫টি, পঞ্চায়েত সমিতির ৯২৭১টি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে ৪৮ হাজার ৬৫০টি আসন। এই সমগ্র আসনের ৫০ শতাংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত।

ঘোষিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ২ এপ্রিল থেকে ৯ এপ্রিল মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়া যাবে। ১১ এপ্রিল মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার পর ১৬ এপ্রিল মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ধার্য হয়েছে। ভোট গণনা হবে ৮ মে।

॥ এক ॥

ভোটের নির্ঘণ্টকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি প্রশ্ন সামনে চলে এসেছে যা অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণও বটে। প্রথমত, নির্দিষ্ট কোনও আইন না থাকলেও সাধারণভাবে চালু প্রথা হলো এই যে, নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার মধ্যে ন্যূনতম ৩৫ দিন সময় রাখা। অতীতেও তা হয়েছে কিন্তু এবার তা আশ্চর্যজনকভাবে কমিয়ে মাত্র ৩০ দিন করা হয়েছে। কেন? এর সাথে যুক্ত হয়েছে আরও দুটি প্রশ্ন। ১ এপ্রিল নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছেন। কিন্তু তার একদিন পূর্বে অর্থাৎ ৩১ মার্চ ডাকা সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য নির্বাচন কমিশন কোনও দিন নির্দিষ্ট করে বলেননি। কিন্তু কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে, মার্চ মাসের মাঝামাঝি বোলপুরে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক বৈঠকে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে, 'পঞ্চায়েত নির্বাচন জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর যে কোনোদিন হতে পারে'। মুখ্যমন্ত্রী এই ঘোষণা কেন করেছিলেন? নির্বাচন কমিশন রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের নির্দেশে চলে। সুতরাং জেনে শুনে স্বজ্ঞানে নির্বাচনের দিন সম্পর্কে কেন এই অসত্য ভাষণ দিলেন? এটি কি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিষয়, না বিরোধীদের অপ্রস্তুতে ফেলে দেওয়ার এক গভীর চক্রান্ত? দ্বিতীয়ত, সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়া জুড়েই রাজ্যে উচ্চ-মাধ্যমিক সহ বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষাগুলি চলেছে। ফলে প্রকাশ্য স্থানে মাইকের ব্যবহার নিষিদ্ধ। তাহলে বিরোধীরা প্রচার করবে কী করে? তৃণমূল কংগ্রেসের এই প্রশ্নে কোনো অসুবিধা নেই। রাজ্যের ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রচলিত প্রতিটি সংবাদপত্রই বিগত কয়েক বছর ধরেই তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপত্র রূপে ভূমিকা পালন করে চলেছে। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনেও তা অব্যাহত থাকবে শুধু নয়, আরও কয়েক গুণ মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া গত সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস থেকে জেলায় জেলায় প্রশাসনিক বৈঠকের নামে সরকারি খরচে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলীয় প্রচারের কাজটি করেই রেখেছেন। সুতরাং সময় কম বা পরীক্ষা উপলক্ষে মাইকের প্রচার নিষিদ্ধ হওয়ায় রাজ্যের শাসকদলের বিশেষ কোনো অসুবিধা হবে না। বিরোধী দল বিশেষত বামপন্থীদেরই এই অসুবিধা ঘটবে এবং তাদের কিছুটা অপ্রস্তুত অবস্থায় নির্বাচনে নামতে বাধ্য করতেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এবারের তিন দফা নির্বাচনে প্রতিটি দফার মধ্যে পার্থক্য মাত্র একদিনের। অষ্টম পঞ্চায়েত নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাঁচ দফায় ভোটগ্রহণ করা হয়েছিল। প্রতি দফার মধ্যে পার্থক্য ছিল অন্তত তিনদিনের ব্যবধানে। কিন্তু কেন এবারে ব্যতিক্রম? নির্বাচন কমিশনার কোনও জবাব দেননি। এর ফলে পুলিশ স্থানান্তরের বেশ অসুবিধা হবে।

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা বজায় রাখাও বেশ সমস্যা হবে। যেমন ১ মে যে ১২টি জেলায় ভোটগ্রহণ হবে, সেখানে রয়েছে ৪০ হাজার বুথ, দু'জন করে সশস্ত্র পুলিশ দিলে ৮০ হাজার পুলিশ প্রয়োজন। রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সব মিলিয়ে ৪৬ হাজার পুলিশ। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ না করলে (রাজ্য সরকার ইতোমধ্যেই এর বিরোধিতা করেছে) সমস্ত বুথে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা অসম্ভব। সেক্ষেত্রে কী সিভিক ভলেন্টিয়ার পাহারায় ভোট হবে? এই আশঙ্কায় ভোটার, নির্বাচন কর্মী সকলেই নিরাপত্তার আশঙ্কায় আতঙ্কিত।

তৃতীয়ত, প্রথম পর্বের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১ মে। এই দিন যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস তা কি রাজ্য সরকারের বা নির্বাচন কমিশনের জানা ছিল না? ইতোমধ্যেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিসহ রাজ্যের শ্রমিক কর্মচারীদের সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানানো হয়েছে। অবিলম্বে দিন বদলের দাবি জানিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নিকট স্মারকলিপি জমা দিয়ে বলা হয়েছে যে, এর পরিবর্তন না হলে আইএলও-র নিকট অভিযোগ জানানো হবে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকেই প্রতিবাদ পত্র দেওয়া হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকারের প্রতি রাজ্যের শাসকদলের নিকৃষ্ট মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

চতুর্থত, মনোনয়ন পত্র পেশের শেষদিন ও প্রত্যাহারের শেষদিনের মধ্যে এক সপ্তাহ ব্যবধান রাখা এক নজিরবিহীন ঘটনা। অতীতে সাধারণভাবে এই ব্যবধান দু-তিন দিনের বেশি থাকতো না। কিন্তু এবারে তার ব্যতিক্রম হলো কেন? এর একটা লক্ষ্য সন্ত্রাস, রাজ্য শাসকদলের হুমকি ইত্যাদিকে প্রতিরোধ করেও যদি কোনও বিরোধী দলের প্রার্থী মনোনয়ন জমা দেয়, তখন চাপ এবং লোভ দেখিয়ে তাকে তা প্রত্যাহারের জন্য এই দীর্ঘ সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই বিরোধীদের পক্ষ থেকে এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। এই আশঙ্কা যে আদৌ অমূলক নয়, তা গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেখা গেছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৩ সালের জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের মোট ৪৮ হাজার ৮০০টি পঞ্চায়েত আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সন্ত্রাস সৃষ্টি করে

পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৮ ঃ মনোনয়নপত্র পেশ করার সময় আক্রান্ত বিরোধীরা

শাসকদলের আক্রমণ সত্ত্বেও বিরোধীরা মনোনয়ন পত্র পেশ করছেন

৫৩৮৬টি আসন 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' দখল করেছিল। এছাড়া পঞ্চায়েত সমিতির ৯২৪০টি আসনের মধ্যে ৮৭৯টি আসন এবং ১৭টি জিলা পরিষদের ৮২৫টি আসনের মধ্যে ১৫টি আসন অর্থাৎ সর্বমোট ৬২৫০টি আসন নির্বাচনের পূর্বেই 'নিরপেক্ষ' রাজ্য নির্বাচন কমিশনের বদান্যতায় তৃণমূল কংগ্রেস দখল করেছিল। আর নির্বাচনী ফলাফল ৩ আগস্ট প্রকাশিত হওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী গভীর তৃপ্তি সহকারে ঘোষণা করেছিলেন 'এ জয় গণতন্ত্রের জয়', 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতির জয়'। এবারে এই প্রক্রিয়া সমাপ্ত করতে আরও বেশি সময় বরাদ্দ করা হয়েছে।

অবশ্য বিরোধীদের জোর করে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে বাধা দেওয়া, বুথ দখল করে দলীয় প্রার্থীদের পক্ষে ছাপ্পা ভোট দেওয়া, ভোট লুঠ করা—এত সবের পরও মাত্র ৫১ শতাংশ আসনে রাজ্যে শাসকদল জয়ী হয়েছিল। তৎকালীন সময়ের ১৭টি জিলা পরিষদের মধ্যে ১৩টিতে তারা 'জয়ী' হয়েছিল। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট আসনের প্রায় অর্ধেক আসনে তারা হেরে যায়। তার মধ্যে পূর্বে উল্লেখিত সাড়ে পাঁচ হাজার আসনও ছিল। এসব আসন বাদ দিয়ে হিসাব করলে সোজাসুজি ভোটে লড়াই করে তৃণমূল কংগ্রেস 'জিতেছিল' মাত্র ৪৫ শতাংশ আসনে। এর মধ্যে বুথ দখল, ব্যাপক ছাপ্পা ভোট এবং গণনার সময় ভোট লুঠও রয়েছে।

এত সন্ত্রাসের মধ্যেও ১৫, ৫৯৩টি আসনে অর্থাৎ শতাংশের বিচারে বামফ্রন্ট ৩২ শতাংশ আসনে জয়লাভ করে। কংগ্রেস জয়ী হয় ৫৫০৬টি আসনে। শতাংশের বিচারে ১১ শতাংশ। অবশ্য এই চিত্রটি এখন নেই। পরবর্তীতে অধিকাংশ পঞ্চায়েতেই বিরোধীদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে রাজ্যের শাসক দল। এই কাজ করেছে কোথাও ভয় দেখিয়ে, কোথাও লোভ দেখিয়ে বা কোথাও এমনকি খুন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, উত্তর ২৪ পরগণার হাসনাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম গাজির নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনা। তাঁকে খুন করার পর পাটিগণিতীয় পথে সংখ্যা কমিয়ে পঞ্চায়েত সমিতিটি দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস। এই ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফারাক্কায় খুন হয়ে যান পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্য হাসমত শেখ। এইভাবে জনগণের রায়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েও পঞ্চায়েত সমিতির দখল করতে খুনের রাজনীতির আশ্রয় নেয় রাজ্যের শাসকদল।

পঞ্চায়েত দখলের সব থেকে ঘৃণ্য নজির তৃণমূল কংগ্রেস স্থাপন করে মুর্শিদাবাদ জেলায়। অষ্টম পঞ্চায়েত নির্বাচনে (২০১৩) বহু চেষ্টা করেও তৃণমূল কংগ্রেস জনগণের ভোট পায়নি। ভোটের মাপকাঠিতে জেলায় তাদের স্থান ছিল তৃতীয় অর্থাৎ বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের পরে। নির্বাচনী ফলাফলে জেলায় ২৫০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাত্র ৮টিতে তারা জয়ী হয়। সেই তৃণমূল কংগ্রেস এখন জেলায় ১৭৫টি পঞ্চায়েত 'দখল' নিয়েছে। জেলার ২৬টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে মাত্র একটি অর্থাৎ সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতিতে তারা জয়ী হয়েছিল। জিলা পরিষদের মোট ৭০টি আসনের মধ্যে মাত্র একটি আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জয়ী হয়েছিল। এহেন জিলা পরিষদও এখন তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের ৪২ জন সদস্যকে নানানভাবে দলত্যাগে বাধ্য করে জিলা পরিষদ দখল করেছে। রাজ্যের শাসকদলের এই দখলদারী ফর্মুলা অন্যত্রও লাগু হয়েছে। বিশেষত মালদহ, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর ইত্যাদি সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়।

এরপরই রাজ্যে চলেছে খুন, সন্ত্রাস, ইউনিয়ন বা পার্টি অফিস দখল প্রভৃতি। আর এই দখলদারির পাশাপাশি চলছে জনগণের অর্থ লুঠ, সরকারি প্রকল্পের অর্থ নয়ছয়, পক্ষপাতিত্ব, স্বজন-পোষণ সহ দুর্নীতি কার্যত এক প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিয়েছে। শাসকদলের সর্বোচ্চ স্তরে অর্থাৎ মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদরা যেমন সারদা, নারদা কাণ্ডে অভিযুক্ত হচ্ছেন, তেমনই পৌরসভা, পঞ্চায়েত প্রশাসনে যুক্ত নেতা-কর্মীরা বিগত পাঁচ বছরে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। নেতাদের প্রাসাদোপম বাড়ি, এখন গ্রাম-শহরের মানুষের কাছে দ্রষ্টব্য স্থানে পরিণত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটেই এবারের নবম পঞ্চায়েত নির্বাচনের গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে হবে।

॥ দুই ॥

এই রাজ্যে পঞ্চায়েতের দীর্ঘ ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্বে একাধিকবার পঞ্চায়েত প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেও, স্বাধীন ভারতের গণ-পরিষদে পঞ্চায়েতের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। দীর্ঘ বিতর্কের পর পঞ্চায়েত বিষয়টি সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিতে স্থান পেলেও তার কোনো কার্যকর রূপ দেখা যায়নি। বরং একে উপেক্ষা করেই ১৯৫২ সালে চালু হয় সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী যা ছিল উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া আমলা নিয়ন্ত্রিত কর্মসূচী। বিগত শতাব্দীর পাঁচের দশকে গান্ধীবাদী নেতা বলে পরিচিত বলবন্ত রাও মেহতা এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। সেখানে পঞ্চায়েতের প্রসঙ্গ ছিল। এরপর আরও কিছু কমিটি গঠিত হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল অশোক মেহতা কমিটি।

এই রাজ্যে ১৯৫৬ সালে পঞ্চায়েত আইন তৈরি হয়। পরবর্তী আইন তৈরি হয় ১৯৬৩-তে সেই সময়েই দিবাকর কমিটি মন্তব্য করেছিল যে, গ্রাম সভায় জনগণের উপস্থিতি খুবই সামান্য। এর কারণও ছিল। গ্রামীণ জনগণের অংশগ্রহণের জন্য যে আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার কারণ ছিল, তার প্রতিকূলতাই এর বড় কারণ। রাজনৈতিক উদ্যোগের ঘাটতি এবং শ্রেণী বিভক্ত ও জাতপাতভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল এর জন্য দায়ী। এরপর ১৯৭৩ সালে একটি পঞ্চায়েত আইন তৈরি হয়। কিন্তু সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় পরিচালিত কংগ্রেস সরকার এই আইন প্রণয়ন করলেও, ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও তারা নির্বাচন করেনি।

রাজ্যে জনগণের রায়ে বিপুল ভোটে জিতে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৭ সালে। ১৯৭৮ সালে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সময়ের অগ্রগতি এবং রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের বহুমুখী সাফল্যের গতিধারায় এটি স্পষ্ট হয় যে এই আইন যথেষ্ট নয়। তাই বার বার আইনকে সংশোধন করতে হয়। প্রধান প্রধান সংশোধনগুলি হয় ১৯৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯৪ এবং ২০০৩ সালে। পঞ্চায়েতে তফশিলী জাতি, আদিবাসী ও মহিলাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা ১৯৯৩ সালের পর শুরু হয়। ভূমি সংস্কারের ইতিবাচক কর্মসূচীর ফলাফলে উপকৃত এই অংশের মানুষ ততদিনে দায়িত্ব ভারগ্রহণে উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। ১৯৯৮ সালে এই সংরক্ষণ নীতি আরও বিস্তৃত হয়।

১৯৮৭ সালে রাজ্যে নবম বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে রাজ্যে কংগ্রেস দলের মুখ্য প্রচারের দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। তিনি রাজ্যে প্রচারে এসে শ্লোগান দিয়েছিলেন 'লালদূর্গে আঘাত হানো'। কিন্তু তাঁর এই প্রচারকে প্রত্যাখ্যান করে রাজ্যবাসী ১৯৮২ সালের থেকেও বেশি সংখ্যক আসনে বামফ্রন্টকে জয়ী করে। একাধিক দেশি-বিদেশী সমীক্ষক সংস্থা এই ফলাফলের জন্য পঞ্চায়েত ও পৌর ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে রাজ্যে যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে, তাকেই চিহ্নিত করে।

এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজীব গান্ধী সারা দেশে পঞ্চায়েতী রাজ স্থাপন করতে সংবিধানের ৬৪তম সংশোধনী সংসদে নিয়ে আসেন। কিন্তু রাজ্যসভায় তা পরাস্ত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯১ সালে পূর্বতন বিলে কিছুটা সংশোধন করে ৭৪তম সংশোধনী বিল ও ৭৩তম সংশোধনী আইন গৃহীত হয়। এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু অন্য রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার তুলনায় এ রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ভূমি সংস্কারের মধ্য দিয়ে সারা দেশের মধ্যে সব থেকে বেশি জমি বণ্টিত হয়েছে এই রাজ্যে এবং ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টিত জমির মালিকানা গেছে প্রধানত তপশিলী জাতি, আদিবাসী এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে। ফলে এদের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

ভূমি সংস্কারের পাশাপাশি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে দ্রুতগতিতে। ভূমি সংস্কার ও পঞ্চায়েতের ব্যবস্থা রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে। গ্রামের মানুষ গ্রামেই কাজ খুঁজে পেয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্যের একাধিক জিলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং পৌরসভা বিরোধী দলের দখলে ছিল। কিন্তু কোনোদিনই কী সরকার কী বামফ্রন্ট এদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেনি বা এইসব সংস্থাকে জোর করে দখল নিতে উদ্যোগী হয়নি। একই দৃষ্টিভঙ্গীতে উভয়কেই বিচার করা হয়েছে।

বামফ্রন্ট সরকারের শেষের দিকে অর্থাৎ ২০০৮ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর সহ চারটি জিলা পরিষদ এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূল কংগ্রেসের দ্বারা পরিচালিত

▶▶ ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান ও ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন দ্রুত চালু করার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে পত্র দেওয়া হয়েছে। এছাড়া রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যপাল সহ বিধানসভায় রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের পত্র দেওয়া হয়েছে।

সাংগঠনিক করণীয় বিষয় ঃ

(১) সদস্যভুক্তি কর্মসূচীতে নেতৃত্বকে দপ্তরে দপ্তরে সব কর্মচারীদের কাছে পৌঁছাতে হবে। কিছু সমিতি ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ঘোষণা করে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে কর্মসূচী করে সাফল্য অর্জন করেছে যা অভিনন্দনযোগ্য। আগামী দিনগুলিতে সদস্য সংগ্রহ অভিযান সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রশাসনের অভ্যন্তরে ব্যাপক অসংগঠিত কর্মচারীদের সদস্য করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে। জুন, ২০১৮ মাসের মধ্যে জেলা, অঞ্চল ও সমিতিগুলিকে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট সহ কেন্দ্রীয়ভাবে জমা দিতে হবে।

(২) পত্র-পত্রিকা গ্রাহকভুক্তিকরণের কাজ শুরু করতে হবে এবং বকেয়া গ্রাহক চাঁদা এপ্রিল, ২০১৮ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় দপ্তরে জমা দিতে হবে।

(৩) জেলা, অঞ্চল, সমিতির নেতৃত্বকে সমিতিগুলির সাংগঠনিক পরিস্থিতি অনুযায়ী পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়েই ঐক্যবদ্ধভাবে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সারা রাজ্য জুড়ে সদস্য সংগ্রহ অভিযান সফল করতে হবে।

(৪) বাঁকুড়া গৃহনির্মাণ ও সর্বভারতীয় সংগঠনের দিল্লী হেড কোয়ার্টার নির্মাণ তহবিল ও বন্যাত্রাণ তহবিলের বকেয়া অর্থ অবিলম্বে কেন্দ্রীয়ভাবে জমা দিতে হবে।

(৫) বিগত রাজ্য কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্কীম/প্রজেক্ট ভিত্তিতে নিযুক্ত চুক্তিপ্রথার কর্মচারীদের সংখ্যা কেন্দ্রীয় দপ্তরে পাঠাতে হবে তাঁদেরকে সংগঠিত করে আন্দোলন সংগ্রামের মূল স্রোতে নিয়ে আসতে হবে।

(৬) **সংগঠন তহবিল, ২০১৮ ঃ** মে-জুন, ২০১৮ মাসের বেতন থেকে তহবিল সংগ্রহ অভিযান (মোট বেতন ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত ১০০ টাকা, ২০,০০১ টাকা থেকে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত ১৫০ টাকা এবং ৩০,০০০ টাকার উর্দ্ধে ২০০ টাকা)। ফ্যামিলী পেনশনার্সদের জন্য ৫০ টাকা। মোট সংগৃহীত তহবিলের প্রাপ্য হবে জেলা ও কেন্দ্র ৬০:৪০ অনুপাতে।

(৭) আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামকে সামনে রেখে সর্বত্র প্রস্তুতি গ্রহণ সহ প্রশাসনিক দায়িত্ব গুরুত্ব সহকারে সজাগ দৃষ্টি রেখে অতীতের ঐতিহ্য অনুসারে ভূমিকা পালন করতে হবে।

দেশের জনবিরোধী উদার আর্থিক নীতি ও সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবং আমাদের রাজ্যের সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার রক্ষা সহ পাহাড়প্রমাণ আর্থিক বঞ্চনার প্রতিবাদে সাহসের সাথে আত্মবিশ্বাস নিয়েই আগামী দিনে অবশ্যম্ভাবী বৃহত্তর সংগ্রামে সমগ্র কর্মচারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে সামিল করতে সর্বত্র প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে। □

দেবাশীষ রায়

সমিতির রাজ্য সম্মেলন সমিতির রাজ্য সম্মেলন

রাইটার্স বিল্ডিংস গ্রুপ ডি কর্মচারী সমিতি

রাইটার্স বিল্ডিংস গ্রুপ ডি কর্মচারী সমিতির ৪৫ তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ কমরেড সুকোমল সেন নগর ও কমরেড কাজল ব্যানার্জী মঞ্চে (কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হল) অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়।

এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য তাপস চক্রবর্তী। তিনি উদ্বোধনী ভাষণে বলেন যে, গত ২০১৪ সাল থেকে কেন্দ্রের সরকার পরিচালনা করছে আর এস এস এর নেতৃত্বে চরম দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি। যারা সমাজের জাতপাতের মেরুকরণের জন্য বিভাজনের রাজনীতি করে চলছে। ফলে বিগত চার বছরে অসংখ্য দাঙ্গা সংগঠিত হয়ে চলেছে। তাতে রাষ্ট্রশক্তি প্রকাশ্যে মদত দিয়ে চলেছে। উদ্দেশ্য হলো সারা দেশে শ্রমজীবী মানুষদের ঐক্যকে বিভাজন করা। পাশাপাশি আমরা যে রাজ্যে বাস করি পশ্চিমবঙ্গে ২০১১ সাল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে চলছে স্বৈরাচারী লুটেরাদের সরকার। বাংলায় গণতন্ত্রের লেশমাত্র নেই। দুটি সরকারই প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িক বিভাজনে মত্ত। এই রাজ্যে বিগত ৭ বছর ধরে সরকারী কর্মচারীসহ সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের অর্জিত অধিকারগুলি আজ সার্বিকভাবে বিপন্ন। বিপন্ন আজ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও। রাজ্য সরকারের জনবিরোধী সার্বিক আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন সংগ্রাম করতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক উত্তম দাস, আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ সোমনাথ নিষাদ। সম্মেলনে ১১টি সময়োপযোগী প্রস্তাব পেশ হয়। ১ জন মহিলাসহ ৮ জন প্রতিনিধি প্রতিবেদনগুলি সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধকের ভাষণের রেশ ধরেই প্রতিনিধিদের আলোচনা উঠে আসে— 'আমাদের অর্জিত অধিকার আজ বিপন্ন, ধর্মঘট করার অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে রাজ্য সরকার। এই অবস্থায় দাবি দাওয়া অর্জন করতে চাই কর্মচারী ও শ্রমজীবীদের এক সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই। লড়াই করেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংসের হাত থেকে রাজ্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ বোস জবাবী ভাষণ দেন।

৪৫ তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন থেকে আগামী কার্যকালের জন্য ৫১ জনের একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে ১৭ জনের একটি কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলী গঠন করা হয়। সভাপতি— সোমনাথ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক— উত্তম দাস, কোষাধ্যক্ষ — সোমনাথ নিষাদ, দপ্তর সম্পাদক— দীপক রায়।

সমগ্র সম্মেলন পরিচালনা করেন শংকর চক্রবর্তী, সোমনাথ ঘোষ, দিলীপ মন্ডল, রেখা দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। □

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির (W B M O A) ৭৮তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ৬ ও ৭ জানুয়ারি দার্জিলিং জেলায় শিলিগুড়ি শহরে। সম্মেলনের শুরুর আগের দিন ৭৮টি লাল পতাকা নিয়ে এক সুসজ্জিত মিছিল শিলিগুড়ি শহর পরিক্রমা করে সম্মেলন স্থলে পৌছয়। এখানে প্রগতিশীল বুকস্টল উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী।

সম্মেলনের শুরুর প্রথম দিনে রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি পিনাকী অধিকারী এবং শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। এরপর উপস্থিত অন্যান্য নেতৃবৃন্দ শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন।

সম্মেলন পরিচালনার জন্য পিনাকী অধিকারী, অলক গুপ্ত এবং লালমোহন গ্রহাচার্য্যকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়।

সম্মেলনে ৭৮টি লাল বাতি জ্বালিয়ে উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর বক্তব্যে আগামী দিনের করণীয় কাজ ও দুই স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করার আহ্বান জানান। সম্মেলনে প্রতিবেদন পাঠ করেন সমিতির যুগ্মসম্পাদক সুখেন কুণ্ডু, ও আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন পেশ করেন সমিতির কোষাধ্যক্ষ গৌতম দাস।

প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন সমিতির প্রতিনিধি ৩৫জন পুরুষ ও ১৪ জন মহিলা। সমস্ত আলোচনা গুটিয়ে জবাবী ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক দেবলা মুখার্জী।

সম্মেলনে মোট প্রতিনিধি ছিলেন ৫২৫ জন, তার মধ্যে ৪৮০ পুরুষ ও ৪৫ জন মহিলা। সম্মেলনে এফ আর ডি আই সম্পর্কে আলোচনা করেন সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সুজিত দাশগুপ্ত। এই সম্মেলন থেকে আগামী দু'বছরের জন্য নবনির্বাচিত পদাধিকারীরা হলেন—

সভাপতি : দেবলা মুখার্জী, সাধারণ সম্পাদক — সুখেন কুণ্ডু, যুগ্ম সম্পাদক— দেবাশীষ মিত্র ও অভীক সেনগুপ্ত, কোষাধ্যক্ষ— গৌতম দাস, দপ্তর সম্পাদক— সমীর দে, মুখপত্র সম্পাদক— মনোজ রক্ষিত, সহযোগী সম্পাদক— ইন্দ্রনীল সান্যাল, সমন্বয় কোষাধ্যক্ষ - গৌতম চক্রবর্তী।

সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় অজয় সেন নগর ও অরুণ দাস মঞ্চে। □

জগদীশ চক্রবর্তী

আলোচনা সভা

গত ১৬ মার্চ, ২০১৮ বর্ধমান জেলায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় "শোষণমুক্তির স্বপ্ন চোখে অর্ধেক আকাশ ঝড় তুলুক" এই বিষয়ে জেলা থেকে তিনজন আলোচনা করেন। ছায়া মণ্ডল, মধুমিতা চ্যাটার্জী ও সুস্মিতা বুট জেলার আলোচক ছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে আলোচনা করেন সুতপা হাজরা। বেলা ২.০০ টায় সভা শুরু হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রীনা কোনার। সভায় ৫১ জন মহিলা সহ মোট ১০১ জন উপস্থিত ছিলেন। □

পঞ্চায়েত নির্বাচনের গুরুত্ব

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

হতো। কিন্তু তাদের পরফরমেন্স জাতীয় স্তরের বিভিন্ন মাপকাঠিতে নিচের দিকে ছিল। এক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। ২০১২-১৩ সালে বাজেট উপলক্ষে রাজ্যের জিলা পরিষদগুলি কেমন কাজ করেছিল তার একটি তালিকা রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর তৈরি করেছিল। এই তালিকায় প্রথম স্থানে ছিল বামফ্রন্ট পরিচালিত বর্ধমান জিলা পরিষদ। আর সর্বনিম্নে ছিল তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত দক্ষিণ ২৪ পরগণা। ১১টি প্রকল্পের অগ্রগতির মাপকাঠিতে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নের সমীক্ষায় এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্যের গ্রামবাংলায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর ছিল। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা সংস্থার একাধিক রিপোর্টে তা স্বীকৃত হয়েছে।

॥ তিন॥

রাজ্যের বর্তমান ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের সর্বত্রই তৃণমূল কংগ্রেসের দখলদারি কায়েম হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দখলদারি গায়ের জোরে কায়েম হয়েছে। গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে এই দখলদারি হয়েছে। বলা বাহুল্য পঞ্চায়েতগুলি দখলের উদ্দেশ্যে গ্রামবাংলার উন্নয়ন নয়। উন্নয়নের মেকি শ্লোগানের আড়ালে আসলে নিজেদের দলের এবং পরিবারের আর্থিক উন্নতিই হলো এর প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য। বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ কাজ না করে বা সামান্য কাজ করে আত্মসাৎ করা এখন স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি সরকারী প্রকল্পের সুবিধা পেতে গ্রামবাসীকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের 'তোলা' দিতে হয়। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও একে অস্বীকার করতে পারেননি। এক সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে এই প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রীর নিদান হলো "চুরি আটকাতে হবে। তাই তাদের মানোন্নয়ন ঘটাতে হবে"। এই মানোন্নয়নের প্রশ্নে তাঁর বক্তব্য 'ভাতা বাড়ানো'। আসলে সারদা কাণ্ডে দলীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের পর কলকাতার রাজপথে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'আমরা সবাই চোর' এই বডি পোস্টারে সজ্জিত হয়ে যারা মিছিল করে, তাদের কাছে আর এর থেকে বেশি কী আশা করা যায়।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজের প্রকল্প সহ বিভিন্ন কর্মসূচীতে ভুরি ভুরি দুর্নীতির নজির রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত কর্মকর্তাদের জামা কাপড়, বাড়ি, আসবাব পত্র, আচার-আচরণ জীবনযাত্রার ধরন দেখলে তা সহজেই বোঝা যায়। পঞ্চায়েতে যে কোনো প্রকল্প রূপায়নের পূর্বে অন্তত পনেরো শতাংশ 'কমিশন' ঠিকাদার কর্তৃক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের দেওয়া বাধ্যতামূলক। কোন কোন সরকারি আধিকারিক নিজেদের বিবেকের তাড়না থেকে এর বিরুদ্ধে কিছু মন্তব্য জমা দিলেও তার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের এক প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে বর্ধমান, নদীয়া এবং বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে, 'এটি বিস্ময়কর, কারণ অনেক কাজ দেখানো হয়েছে স্যাংশান হিসেবে। পঞ্চায়েত এবং বিভিন্ন পর্যায়ে অনেক কাজ শুরু হয়ে গেছে বলেও দেখানো হয়েছে। যদিও আমরা আর্থিক বছরের দ্বিতীয় মাসেই হাজির হয়েছিলাম, কিন্তু আমরা কোন অনগোয়িং কাজ বাস্তবের মাটিতে দেখতে পাইনি'।

রাজ্য ভূমি সংস্কারের কাজ কার্যত বন্ধ। কিন্তু জমি নিয়ে যে বিপুল দুর্নীতি হচ্ছে, তাতে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা আর্থিক দিক থেকে ফুলে-ফেঁপে উঠছেন। ভাঙড়, ভাবাদীঘি, বোলপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ঘটনা তার প্রমাণ।

তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত পরিচালনার কেন্দ্রে রয়েছে অসত্য ভাষণ আর মিথ্যাচার। এর অন্যতম উদাহরণ হলো জমির খাজনা হ্রাসের গল্প! বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই অল্প জমির মালিকদের খাজনা মুকুব করা হয়েছিল। সামান্য কিছু পরিবর্তন করে চারিদিকে প্রচার চালানো হলো যে, জমির খাজনা মুকুব করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার। কিন্তু এই মিথ্যা প্রচারের আড়ালে জমির মিউটেশন ফি কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হলো। এই বৃদ্ধির হার কোথাও ৪০ গুণ, কোথাও ১০০ গুণ, কোথাও তার বেশি। এক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে, ২০০৫ সালে নামমাত্র মিউটেশন ফি বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এই নির্দেশিকা অনুসারে রাজ্যে গ্রামাঞ্চলে ১ ডেসিমেল জমির নিউটেশন করতে ব্যয় হতো এক টাকা। অর্থাৎ এক একরের জন্য ১০০ টাকা দিতে হতো। বর্তমানে তা বৃদ্ধি করে একর প্রতি হয়েছে চার হাজার টাকা। অর্থাৎ ৪০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে পঞ্চায়েত স্তরের কর্মচারীরা আক্রান্ত। পঞ্চায়েত প্রশাসনে প্রায় ১১ হাজার পদ শূন্য। ফলে কাজের চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও প্রশাসনিক সন্ত্রাসে পঞ্চায়েত কর্মচারীরা বিপর্যস্ত। নানান ধরনের অনৈতিক কাজের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে কেউ কেউ হৃদরোগে আক্রান্ত হচ্ছে বা মানসিক রোগীতে পরিণত হচ্ছে। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর বর্ধমান জিলা পরিষদের কর্মচারী রফিকুল হাসান শেখ খুন হয়েছেন।

পঞ্চায়েত কর্মচারীদের ন্যায় রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও আক্রান্ত। বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রকাশিত না হওয়ার পাশাপাশি বদলী, পদোন্নতি আটকে দেওয়ার ন্যায় প্রশাসনিক সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে। কর্মচারী ও তাঁদের পরিবারবর্গ বিভিন্নভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নপর্বে যে ধরনের সন্ত্রাস পরিলক্ষিত হচ্ছে, ভোটগ্রহণ বা গণনার সময় এই মাত্রা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে। তাই নির্বাচনকর্মী হিসেবে রাজ্য সরকারী কর্মচারী বা পঞ্চায়েত কর্মচারীদের অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্ধিত ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। বুথে প্রকৃত ভোটাররা যাতে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে একই সাথে রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও পঞ্চায়েত কর্মচারীদের জীবন জীবিকার স্বার্থে আগামী দিনে রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে পরিবার পরিজনসহ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে।

।। চার।।

রাজ্যে নবম পঞ্চায়েত নির্বাচনের রাজ্য ও জাতীয় প্রেক্ষাপটটিও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের শাসনকালে জীবন-জীবিকা, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিপন্ন। রাজ্য সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, পৌরসভা, পঞ্চায়েত স্তরের কর্মচারীদের ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা বাকি। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ কবে প্রকাশিত হবে কেউ জানে না। লক্ষাধিক পদ শূন্য, অথচ বিপুল সংখ্যক বেকার কাজ না পেয়ে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়ে অসহ্য যন্ত্রণা এমনকি মৃত্যুর মুখোমুখি। বিমুদ্রাকরণের ফলে অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী কর্মচ্যুত হয়েছেন। নতুন শিল্প স্থাপন তো হচ্ছেই না, পরন্তু চালু কারখানাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনীতির শোচনীয় অবস্থায় ক্ষেতমজুর, কৃষকরা অনাহারে রয়েছে। ধান, পাট, পেঁয়াজ, সব্জী প্রভৃতির দাম কৃষক পাচ্ছে না। ফলে অতীতে যা হয়নি, অন্য রাজ্যের ন্যায় কৃষক আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে। মানুষের প্রতিবাদ করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনকালে অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচনকেই প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমশই অবনতি ঘটছে। নারী নির্যাতন ক্রমবর্ধমান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে চলছে নৈরাজ্য।

জাতীয় ক্ষেত্রে নব্য উদারনীতির, হিন্দুত্ববাদের আক্রমণ ও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী প্রবণতার শিকার এই রাজ্যের মানুষ। কারণ আর্থিক নীতির প্রশ্নে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে কোন ফারাক নেই। আর এস এস-বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতাবাদের পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু মৌলবাদের প্রতি প্রশ্রয় দান রাজ্যে প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা জন্ম দিয়ে চলেছে। এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের সংগ্রাম আসন্ন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের গুরুত্বকে অনুধাবন করে লুঠেরাদের হাত থেকে পঞ্চায়েতকে উদ্ধার করতে পারলে তা আগামী দিনে বিশেষত রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সংগ্রামে এবং ধর্মনিরপেক্ষ ভারত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। □

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৮

গণতন্ত্র, স্বাধিকার, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ——পুনরুদ্ধারের লড়াই

রাজ্যে উৎপাদিত হয় (২০১০ সাল)।

□ ২০১০ সালে সবজি উৎপাদনে (আলু ছাড়া অন্যান্য সবজির উৎপাদন প্রায় ১৩০ লক্ষ মেট্রিক টন) দেশের মধ্যে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ।

□ আলু উৎপাদনে (প্রায় ৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন) ২০১০ সালে আমরা দেশের মধ্যে দ্বিতীয়। দেশের ৩৫ শতাংশ আলু এ রাজ্যে উৎপাদিত হয়েছিল সে বছর।

□ ২০১০ সালে আনারস, লিচু ও আমের উৎপাদনে সমগ্র দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও অষ্টম।

□ ২০১০ সালে সবজি ও ফল উৎপাদন মিলিতভাবে ধরলে দেশের মোট উৎপাদনের ১৫ শতাংশ উৎপাদিত হয় পশ্চিমবঙ্গেই।

□ সামগ্রিকভাবে ফুল উৎপাদনে ২০১০ সালে দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ছিল তৃতীয় স্থানে।

□ ২০১০ সালে ভোজ্য তেলের শতকরা ১০ ভাগ পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত হয়।

□ দেশে চা উৎপাদনের প্রায় চার ভাগের এক ভাগ এ রাজ্যে হয় (২০১০)। চা রপ্তানি থেকে দেশের যা আয় তার ৪৫ শতাংশ হতো পশ্চিমবঙ্গ থেকে।

□ মৎস্য উৎপাদনেও ক্রমাগত উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের প্রথম স্থান পশ্চিমবঙ্গই বামফ্রন্ট সরকারের সময়পর্বে বজায় রেখেছিল।

□ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে রেকর্ড পরিমাণ বিনিয়োগ এসেছে বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে। ২০০৬-০৭ থেকে ২০০৯-১০ অর্থবর্ষে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ১৪২৬টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, যেগুলিতে মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৩৩০৫ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৩২৫ জনের।

□ **প্রফলাল ও আম আদমি যোজনা ঃ** বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে ভূমিহীন কৃষকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রকল্পেও (প্রফলাল) উপকৃতের সংখ্যা প্রচুর বাড়ানো হয়েছিল। ২০১০ সালে প্রফলাল ও আম আদমি যোজনার আওতায় আনা হয় ২৫ লক্ষ ভূমিহীন খেতমজুরকে। বয়সসীমাও ৫০ থেকে বাড়িয়ে ৬০ বছর পর্যন্ত করা হয়েছিল।

□ **আলুচাষীদের সাহায্য ঃ** ২০০৯ সালে অধিকফলনে ক্ষতিগ্রস্ত আলু চাষীদের বাঁচাতে এক বছরে ৪০০ কোটি টাকা খরচ করে রাজ্য সরকার আলু কেনে। কৃষকদের স্বার্থরক্ষাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

□ **ইন্দিরা আবাসন যোজনা ঃ** সপ্তম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ইন্দিরা আবাসন যোজনায় ২০০৮-০৯ সালে নির্মিত হয়েছে ১, ১১,৫১২টি বাড়ি। ২০০৯-১০ সালে তৈরি হয়েছে ২,১৪,৮২৭টি বাড়ি।

□ **পারিবারিক শৌচাগার ঃ** ২০০৮-০৯ সালে পারিবারিক শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছিল ৪, ৪৮,১২০টি। ২০০৯-১০ সালে তৈরি হয়েছিল ৫,২৯,৬৬৩টি। আগের বছরের থেকে ৮১,৫৪৩টি বেশি।

□ **দরিদ্রদেরজন্যপাকাবাড়ি ঃ** দরিদ্র, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নে দায়বদ্ধ ছিল বামফ্রন্ট সরকার। ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে বামফ্রন্ট সরকার 'আমার বাড়ি' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। মাসে ছ'হাজার টাকা পর্যন্ত পারিবারিক আয় এবং নিজের পাকা বাড়ি নেই এমন দরিদ্র মানুষের জন্যই এই প্রকল্পের অধীনে পাকা বাড়ি করে দেওয়া হয়। মৎস্য দপ্তর, বন দপ্তর, সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তর, সংখ্যালঘু দপ্তর, অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তর, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এবং আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি প্রভৃতি কর্তৃপক্ষ এই প্রকল্প রূপায়ণ করে।

□ **প্রাণীসম্পদ কর্মসংস্থান ঃ** বামফ্রন্ট সরকারের প্রাণী সম্পদ বিভাগ বছরে ২০ লক্ষের বেশি মুরগির বাচ্চা বিনামূল্যে স্বনিযুক্তি মহিলাদলের সদস্যদের মধ্যে বিলি করে। বার্ড ফ্লুর সময় কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত ক্ষতিপূরণ ছাড়াও তৎকালীন রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের এককালীন ৫০০ টাকা ও পরবর্তী পর্যায়ে ১৫০০ টাকার ছাগ পালন প্রকল্পে প্রদান করে। যা সারা দেশে এক বিরল নজির স্থাপন করেছে। ২০০৯-১০ সালে সারা রাজ্যে প্রায় ২৭ লক্ষ গাভীর কৃত্রিম প্রজনন করা হয়। যা এক নতুন রেকর্ড। রাজ্যে প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রায় ৭৬ লক্ষ মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থান হয়।

□ অরণ্য এবং অরণ্য সংলগ্ন এলাকায় উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ২০০৬-০৭ আর্থিক বর্ষের তুলনায় ২০১০-১১ আর্থিক বর্ষে তিন গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনা খাতে এই বরাদ্দ ৩১.৭০ কোটি থেকে বেড়ে হয় ১০৩.৮৮ কোটি টাকা।

২ টাকা কিলো চাল

□ পশ্চিমবঙ্গের ২ কোটি ৬৪ লক্ষ গরিব মানুষকে ২ টাকা কেজি দরে চাল দেওয়া শুরু করে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার। শুধু বি পি এল নয়, এ পি এল ভুক্ত দরিদ্র মানুষদেরও এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির চাপে সমস্যাগ্রস্ত মানুষের পাশে সর্বদাই ছিল বামফ্রন্ট সরকার। □

একশো দিনের প্রকল্প ঃ কাজ দিলেও প্রশাসনের কোপে

দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার একশো দিনের কাজের প্রকল্পের একটি রিপোর্ট ২০১২-র নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে হাজির করেছিল জাতীয় পর্যায়ের এক কর্মশালায়। সেই তথ্যাবলী জানাচ্ছে ২০০৮-০৯ সালে গৃহীত ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১৭ হাজার। কাজ শেষ হয়েছিল ১ লক্ষ ৩২টি। কাজ শেষের হার ছিল ৮৪.৮১ শতাংশ। ২০০৯-১০ বর্ষে জঙ্গলমহলসহ রাজ্যের নানা জায়গায় নৈরাজ্যের ষড়যন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও কাজ শেষের হার ছিল ৯০.৫২ শতাংশ। সে বছর রাজ্যখাতে প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৬৩৯টি। শেষ হয়েছিল ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫৫৪টি। ২০১০-১১-তে রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে কাজ শুরু হয়েছিল ২ লক্ষ ১৫ হাজার ৭০০টির। কাজ শেষ হয়েছিল ১ লক্ষ ৮৯ হাজার ২২১টির। রাজ্যে প্রকল্প শেষ হওয়ার হার ছিল ৮৭.৭২ শতাংশ।

তারপরই রাজ্যে সরকার পরিবর্তিত হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসন শুরু হয়। ২০১১-১২-তে রাজ্যে শুরু হয়েছিল ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৬৩৩টি প্রকল্পের কাজ। রাজ্যগুলির পরিকল্পনা হয়েছিল বিগত সরকারের আমলে মার্চ-এপ্রিলে। কিন্তু সেই বছর তথাকথিত 'পরিবর্তনের সরকার' কাজ শেষ করতে পেরেছিল মাত্র ৬৫ ভাগ। কাজ শেষ হয়েছিল ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯৯৯টির।

রেগা প্রকল্পই দেখিয়ে দিচ্ছে গরীব মানুষ বর্তমানে অবহেলিত। রাজ্যের ইচ্ছুক ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের মাত্র ২ শতাংশকে দিয়েছে বর্তমান সরকার। অথচ জব কার্ড প্রত্যেকের পাওয়ার কথা। ২০১১ সালের ফাস্ট সেনসাস অনুসারে রাজ্যের প্রায় ৭১ লক্ষ পরিবার শ্রমনির্ভর ভূমিহীন খেত মজুর। তাঁদের মধ্যে গত প্রায় চার বছর ধরে সমীক্ষা চালানো হচ্ছে। সমীক্ষা করে জানা হচ্ছে তাঁরা একশো দিনের প্রকল্পে কাজ করতে চায় কি না। এখনও পর্যন্ত ৪০ লক্ষ ১৫ হাজার পরিবারের মধ্যে সমীক্ষা হয়েছে। তার মধ্যে ৩ লক্ষ ২০ হাজারের বেশি কিছু পরিবার একশো দিনের প্রকল্পে কাজ করতে চায় বলে জানিয়েছে। এঁরাই হল "ইচ্ছুক" ভূমিহীন খেতমজুর। এই ইচ্ছুকদের মধ্যে রাজ্য সরকার দিতে পেরেছে ৭৩১৭টি পরিবারকে। যা ইচ্ছুক পরিবারগুলির মাত্র ২.২ শতাংশ।

এখন পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে একশো দিনের প্রকল্পে কাজ দেওয়াটা প্রশাসন অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করছে। এই কারণেই শোকজ করা হয়েছে বীরভূমের ইসলামপুরের ব্লকের জয়দেব-কেঁদুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দাস বৈরাগ্যকে। গত ২২ ফেব্রুয়ারি '১৮ এই শো কজের চিঠি দেওয়া হয়েছে। বি ডি ও-র সই করা চিঠিতে কৃষ্ণচন্দ্র দাস বৈরাগ্যকে জানানো হয়েছে যে, "আমরা জানতে পেরেছি চলতি বছরের ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত (অর্থাৎ ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) ১০৮টি নতুন পরিবারকে কাজ দেওয়া হয়েছে রেগা প্রকল্পে। আপনি ইতিমধ্যেই জানেন যে, বীরভূমের জেলা শাসকের নির্দেশ অনুসারে নতুন কোনো পরিবারকে এখন রেগা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এই নির্দেশের কথা আপনাকে একাধিকবার জানানো হয়েছে। এম আই এস (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম) রিপোর্ট অনুসারে রেগা প্রকল্পে গত ৪ ফেব্রুয়ারি ৪টি, ১৯টি ফেব্রুয়ারি ৫৪টি নতুন পরিবারকে যুক্ত করা হয়েছে এবং ২২ ফেব্রুয়ারি এই সংখ্যা ১০৮-এ বেড়ে দাঁড়িয়েছে।' কেন তিনি নতুন ১০৮ পরিবারকে কাজ দিয়েছেন তার কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই চিঠিতে।

এইরকম চিঠি বাদুড়িয়া, নন্দীগ্রাম-২ সহ বিভিন্ন ব্লকের পঞ্চায়েতের নির্মাণ সহায়করা পেয়েছেন। অথচ রেগা প্রকল্পের আইন অনুসারে গ্রামের একটি জব কার্ডধারী পরিবার যখন খুশি কাজ চাইতে পারে পঞ্চায়েতের কাছে। পনের দিনের মধ্যে রাজ্য দিতে না পারলে, সেই পরিবারের ভাতা প্রাপ্য হয়। পঞ্চায়েত, প্রশাসন, সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা। অথচ এ রাজ্যে তার উল্টোটা ঘটছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে ৮১ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির অবাস্তব দাবি করছেন। আর তলে তলে কাজের সুযোগ বন্ধ করে দিচ্ছেন।

কিন্তু কাজ না দেবার কৌশল নিতে হচ্ছে কেন সরকারকে। পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে যে গড় কাজের দিন বেশি করে দেখানোর জন্যই এই কাজ ছাঁটাইয়ের কৌশল। কারণ পরিবার কমিয়ে দিলে গড় কাজের দিন বেড়ে যাবে। গড় কাজের দিন বৃদ্ধিটাকেই প্রচারের লক্ষ্যবস্তু করতে চায় সরকার। অথচ রেগায় কত বেশি পরিবারকে কাজ দেওয়া যায়, সেটাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই কারণেই ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে এ রাজ্যে একশো দিনের প্রকল্পে কাজ চেয়েও পায়নি ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭২টি পরিবার। □

কি হাল স্বল্প সঞ্চয়ের

	০১.০৪.২০১৪ (বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার আসার আগে)	৩১.০৩.২০১৮ (বর্তমান হার)
রেকারিং ডিপোজিট (আর ডি)	৮.৪%	৬.৯%
১ বছরের টার্ম ডিপোজিট (টি.ডি)	৮.৪%	৬.৬%
২ বছরের টার্ম ডিপোজিট (টি.ডি)	৮.৪%	৬.৭%
৩ বছরের টার্ম ডিপোজিট (টি.ডি)	৮.৪%	৬.৯%
৫ বছরের টার্ম ডিপোজিট (টি.ডি)	৮.৫%	৭.৪%
মান্থলি ইনকাম স্কীম (এম.আই.এস)	৮.৪%	৭.৩%
পি. এফ	৮.৭%	৭.৬%
সুকন্যা সমৃদ্ধি অ্যাকাউন্ট (এস এস এ)	৯.১% (১ জানু. '১৫তে চালু)	৮.১%
সিনিয়র সিটিজেনস্ সেভিংস স্কীম (এস.সি.এস.এস)	৯.২%	৮.৩%
কে.ভি.পি.	৮.৭% ম্যাচুরিটি ১০৩ মাস	৭.৩% ম্যাচুরিটি এখন ১১৮ মাস

এই কেন্দ্রীয় সরকার, তার স্বল্প সঞ্চয় নীতি আম-আদমির জন্য 'আচ্ছে দিন' আনবে?

ধ্বংসের মুখে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

'স্বাস্থ্যই সম্পদ' এই প্রবাদ বাক্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো দেশ বা রাজ্যের অন্যতম সম্পদ হচ্ছে জনগণের সুস্বাস্থ্য। শারিরীক সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার সাথে জড়িয়ে আছে মানসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যও সুন্দর রাখা। পরিকল্পনা, পরিকাঠামো, প্রয়োগ যদি সঠিকভাবেই হয় তবেই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে স্বাস্থ্যকে সম্পদে পরিণত করা যায়। কিন্তু বর্তমানে আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কার্যত ধসে যেতে বসেছে, সম্পদ সৃষ্টি তো দূরের কথা। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে রাজ্যের ৭০ শতাংশ জনগণের সরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর আস্থা ছিল। কিন্তু বর্তমানে ঠিক তার উল্টোটাই হচ্ছে। এখন রাজ্যের ৭০ শতাংশ জনগণকেই প্রায় বাধ্য করা হচ্ছে বেসরকারী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। এ রাজ্যের সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবা বর্তমানে একটা বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

সরকারী কোষাগার থেকে বহু অর্থ ব্যয় করে বহু বিজ্ঞাপন দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের কর্ণধার জেলায় জেলায় 'সুপার স্পেশালিটি', 'মাল্টি স্পোশালিটি' হাসপাতালের দ্বারোদঘাটন করেছেন উপযুক্ত পরিকাঠামো ছাড়াই। প্রয়োজনীয় ডাক্তার, নার্স, গ্রুপ ডি সহ কর্মচারীর অভাব সুস্পষ্ট। এই সমস্ত হাসপাতালের বহু দামী যন্ত্রপাতি শুধুমাত্র অব্যবহৃত অবস্থায় নষ্ট হচ্ছে। আবার হাসপাতালগুলিতেও বহু ডিপার্টমেন্ট আলাদা আলাদা খুলে দিচ্ছেন। যেমন--- নিওনেটাল ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট, সিক নিওনেটাল কেয়ার ইউনিট, পেডিয়াট্রিক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট ইত্যাদি। অথচ সমস্যা একই, কর্মচারী নেই। সদর বা মহকুমা স্তর থেকে কর্মচারীদের একটা অংশকে সেখানে কাজে লাগানো হচ্ছে। যার ফলে সদর বা মহকুমা হাসপাতালেও কর্মচারীর অভাব দেখা দিচ্ছে, পরিষেবাও ঠিকমতো দেয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান খুলে দিয়েছেন কিন্তু এই সব দোকানে কোনো ওষুধই যে ন্যায্য মূল্যে বা বিনা পয়সায় রাজ্যের মানুষ পাচ্ছেন না, তা হাড়ে হাড়ে মানুষ বুঝতে পারছেন। এই সমস্ত দোকানগুলিতে ব্র্যান্ডেড ওষুধ যে দামে বিক্রি হচ্ছে, তার থেকে অনেক কম দামে ঐ ওষুধ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা। এ ক্ষেত্রে ডাহা ফেল রাজ্য। বিভিন্ন রোগের মধ্যে কুষ্ঠ হচ্ছে একটি অন্যতম ভয়ানক রোগ যা অতীতে অনেক বেশি ছিল এ রাজ্যে। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে সরকারি প্রচেষ্টায় এই রোগকে নিয়ন্ত্রণে আনা গেছিল। এই রোগের জন্য যে আলাদা বিভাগ ও কর্মচারীরা ছিল একসময়ে এই সমস্ত কর্মচারীদের কাজ কমে যাওয়ায় স্বাস্থ্য বিভাগের অন্য প্রকল্পে অর্থাৎ বহুমুখী স্বাস্থ্য প্রকল্পে তাদের মার্জ করে নেয়া হয়। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে এই সরকারের আমলে কুষ্ঠরোগ আবার ভয়ানক রূপ ধারণ করছে। সরকারিভাবে আবার শুরু হচ্ছে এই রোগ শনাক্তকরণের কাজ। উদ্বেগজনক পরিস্থিতি হয়েছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, দুই দিনাজপুর ও মেদিনীপুরে। স্বাস্থ্য দপ্তরের কাজের ও কর্মীর অভাবেই নতুন করে বাড়ছে এই রোগ। 'পঞ্চায়েত রাজ' ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সংখ্যার তথ্য বলছে যে, ২০১৫-১৬ সালে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে আক্রান্ত ছিলেন ৬৫৯ জন, তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১০৩ জন। বর্ধমানে ৭৫৬ থেকে হয়েছে ১৪২৮ জন, বীরভূমে ৪৭২ থেকে ৫৫৩, দক্ষিণ দিনাজপুরে ২৯৮ থেকে ৪৭৬, উত্তর দিনাজপুরে ৫২৯ থেকে ৮৭৮, পুরুলিয়ায় ১০৮৮ থেকে ১৫১৪ জন। গুজরাট ও বিহারে ছিল সবচেয়ে বেশি কুষ্ঠ রোগী। কিন্তু এখন পাল্লা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গও এগিয়ে চলেছে।

ন্যাশনাল রুরাল হেলথ মিশন প্রকল্পের রূপায়ণে যে এ রাজ্য ব্যর্থ তা সি এ জির রিপোর্টেই প্রকাশ পেয়েছে। পঞ্চায়েত স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে একটি বিশাল ভূমিকা পালন করে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি ও তার কর্মচারীরা। সি এ জি-র রিপোর্ট অনুযায়ী সাব সেন্টারগুলিতে গরীব মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চূড়ান্ত অভাব রয়েছে। গোটা রাজ্যে যেখানে সাব সেন্টার বা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রয়োজন ১৮২৮০টি, সেখানে রয়েছে ১০৩৬৯টি। ৭৯১১টি (প্রায় ৪৩ শতাংশ) সাব সেন্টারের অভাব রয়েছে এ রাজ্যে। আবার সাব সেন্টারে যে ফার্স্ট এ এন এম ও সেকেণ্ড এ এন এম আছেন তাও নয়। এমন বহু সেন্টার আছে সেখানে প্রথম এ এন এম ও ২য় এ এন এম একজনও নেই। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কর্মচারীর অভাব পরিলক্ষিত। আবার বেশিরভাগ সেন্টারেই জল, বিদ্যুৎ, বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। এই উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে একমাত্র মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীরাই কাজ করেন অথচ সারাদিন তাদের জন্য কোনো টয়লেটের ব্যবস্থা নেই। একই অবস্থা প্রাইমারি হেলথ সেন্টার ও কমিউনিটি হেলথ সেন্টারগুলিরও। তথ্য বলছে ২০১১ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে ৭৩৫২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। তার মধ্যে খরচ হয়েছে ৪০৫৪ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মাত্র ৫৫ শতাংশ খরচ করতে পেরেছে রাজ্য। কাজ হয় নি ৪৫ শতাংশ টাকার।

আবার বাস্তব অভিজ্ঞতায় বলা যায় এই অপ্রতুল কর্মচারী ও পরিকাঠামোর মধ্যেও অতিরিক্ত দায়িত্ব বহন করে যখন কর্মচারীরা কাজ করছেন গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবায়, সেখানে পর্যাপ্ত অতি সাধারণ প্রয়োজনীয় ওষুধও সরবরাহ হচ্ছে না সরকারিভাবে। যদি একটি সেন্টারে মাসে ১০ জন গর্ভবতী মা রক্তাল্পতার বড়ি (আয়রন ফলিফার ট্যাবলেট আই. এফ. এ) পাওয়ার যোগ্য থাকেন, যেখানে একজন মা মাসে ১০০ এমজি ট্যাবলেট ৩০টি পাবে, সুতরাং ১০ জন মায়ের জন্য দরকার মাসে ৩০০০ ট্যাবলেট, যেখানে মাসে মাত্র ১০০০-১৫০০ ট্যাবলেট প্রতি সাব সেন্টারে দেওয়া হচ্ছে। আবার সাধারণ ওষুধ অর্থাৎ প্যারাসিটামল, মেট্রোজিল ইত্যাদিও চাহিদার তুলনায় খুবই কম সরবরাহ হচ্ছে। এর ফলে গ্রামে কাজ করতে গিয়ে অসুবিধায় পড়ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার প্রশংসা সারা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। তাই আমাদের অর্থাৎ পঞ্চায়েত স্তরে যারা বাস করি তাদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিন এসে উপস্থিত হয়েছে। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA | **State Co-ordination Committee** | **Regd. No. : 18484/71**
SANGRAMI HATIAR | 46th Year, 11th Issue, March '18 | Price : Two Rupees

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের কর্মসূচী প্রতিপালিত

আলোচনা করছেন অধ্যাপিকা ডঃ মালিনী ভট্টাচার্য

"শোষণমুক্তির স্বপ্ন চোখে অর্ধেক আকাশ ঝড় তুলুক" --এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রতিপালিত হল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের কর্মসূচী।

গত ২২ মার্চ কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার মুখ্য বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মালিনী ভট্টাচার্য।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতিপালনের তাৎপর্য উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে দ্বিতীয় সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলন থেকে সিদ্ধান্ত হয় –নারীদের ভোটাধিকার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমানাধিকারের দাবিকে তুলে ধরার জন্য বছরে একটি দিন আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হবে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ফ্যাক্টরি শ্রমিকদের মধ্যে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়তে থাকে। নিদারুণ শোষণ-বঞ্চনার শিকার ছিলেন তাঁরা। তাঁদের হাত ধরেই নারী আন্দোলনের সূত্রপাত। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন তাঁরা।

শ্রমিক হিসাবে এবং সামাজিক দিক থেকে নারীদের প্রতি বৈষম্য আজকের পৃথিবীতেও বিদ্যমান বরং বহুক্ষেত্রে তা দারুণ তীব্র আকার ধারণ করছে। ট্রাম্প সরকারের বর্ষপূর্তির দিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহিলারা কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে এবং সমকাজে সম মজুরীর দাবিতে পথে নেমেছিলেন।

পুঁজিবাদের প্রথম যুগে যে কারখানাভিত্তিক উৎপাদন ছিল তা এখন আর সেভাবে নেই। উৎপাদনের মাধ্যমে মুনাফা বাড়ানো হচ্ছে না, টাকা থেকেই টাকা বাড়ানো হচ্ছে। সারা পৃথিবীতে নিযুক্তি বন্ধ। কাজের সময় দীর্ঘ হচ্ছে। ৯৩ শতাংশ মহিলাই অসংগঠিত ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক কাজ করেন। আই এল ও-র তালিকাভুক্ত যত রকমের কাজ আছে দেখা যাচ্ছে, বহু মহিলা শ্রমিকের কাজের ধরনের জন্য তাদের সেই তালিকায় ফেলা যাচ্ছে না। ফলে দেশের মোট উৎপাদনে তাদের শ্রম নিযুক্ত হলেও কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণের হিসাবের সময় তাদের ধরা হচ্ছে না। তাঁরা থেকেও অদৃশ্য হয়ে আছেন। নয়া উদারনীতির যুগে শিক্ষিত ছেলে মেয়েরাও উপযুক্ত কাজ পাচ্ছেন না। এমনকি প্রাক্‌-পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা ফিরে আসছে বেগার শ্রমের মধ্যে দিয়ে।

ট্রেড ইউনিয়ন এবং নারী আন্দোলনের মধ্যে মেলবন্ধন না করতে পারলে নারীর ঘরে-বাইরের জগতের সমস্যাগুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যাবে না এবং তাঁদের সংগঠিত করাও যাবে না। আজকে মেয়েরা যখন ভোটাধিকার পেয়েছে, শিক্ষার অধিকার পেয়েছে, কিন্তু পণপ্রথার শিকার হওয়া কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার উভয়েই নারীদের উন্নয়নের জন্য হাজার প্রচার চালালেও সত্যিকারের কোনো পরিকল্পনা, প্রকল্পে নির্দিষ্ট বরাদ্দ কিছুই নেই। শিক্ষা, চেতনা, প্রযুক্তির এত উন্নতির পরও মেয়েদের বিয়েটাই যেন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রাজ্য সরকারের পশ্চাদ্‌পদ ভাবনাই কাজ করছে। ধর্মীয় বিদ্বেষের এক বিষাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে সবচেয়ে আক্রান্ত হচ্ছে নারীরা। তিন তালাক রদের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী যে আইন হল কেন্দ্রীয় সরকার তার কৃতিত্ব নিতে চাইছে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে বামপন্থী নারী আন্দোলনের কর্মীরা এই বিষয়ে লড়াই চালাচ্ছিলেন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ তাঁর প্রারম্ভিক উপস্থাপনায় বলেন, বর্তমান সময়ে বহুমুখী আক্রমণে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত শোষিত হচ্ছেন নারীরা। রাজ্য সরকারী দপ্তরগুলিতে মোট কর্মচারীর ২৫ শতাংশ মহিলা। তাদের সংগঠিত করা এবং তাদের দাবিগুলি তুলে ধরার কথা সংগঠন গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে।

কেন্দ্রীয় মহিলা উপসমিতির আহ্বায়িকা সুতপা হাজরা বলেন, নারী দিবস উদ্‌যাপন আজও প্রাসঙ্গিক, কেন না সম কাজে সম মজুরী এবং কাজের সময় কমানোর দাবি আজও অধরা থেকে গেছে। গার্হস্থ্য হিংসা বিল, ২০০৫ সালে পাশ হলেও এখনও নারীর ওপর হিংসা বন্ধ হয়নি। চাকুরীজীবী মহিলারা যৌন হেনস্থার শিকার। নয়া উদারবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ উভয় দ্বারাই নারীরা আক্রান্ত। আলোচনা সভাটি পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় মহিলা উপসমিতির অন্যতম সদস্যা দেবলা মুখার্জী। □

শাশ্বতী মজুমদার

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ষোড়শ জাতীয় সম্মেলন

সম্মেলনের উদ্বোধন করছেন সি আই টি ইউ -র সহ-সভাপতি এ কে পদ্মনাভন

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ষোড়শ জাতীয় সম্মেলন গত ৫-৮ এপ্রিল '১৮ চেন্নাইতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তামিলনাড়ুর চেন্নাই শহরের রামলক্ষ্মী প্যারাডাইস হলে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উপলক্ষে চেন্নাই শহরের নামকরণ করা হয় কমরেড সুকোমল সেন নগর এবং সম্মেলন মঞ্চের নামকরণ করা হয় কমরেড মুথুসুন্দরম কক্ষ। ৫ এপ্রিল সকাল ১০টায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার কর্তৃক রক্তপতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সি আই টি ইউ-র সর্বভারতীয় সভাপতি এ কে পদ্মনাভন। সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমারের পেশ করা প্রতিবেদনের উপর ২২টি রাজ্যের ৪৪ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। মহিলা প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দেশের প্রায় সব রাজ্য থেকে সহস্রাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ এবং যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী সহ ৫০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন শেষ হবার পর ৮ এপ্রিল চীপক স্টেডিয়ামে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন।

সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত পদাধিকারীগণ নির্বাচিত হন। চেয়ারম্যান—সুভাষ লাম্বা, জেনারেল সেক্রেটারি—এ শ্রীকুমার, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারিদ্বয়— বিজয় শংকর সিংহ ও আম্বারাশু (তামিলনাড়ু)। এছাড়াও ১২ জন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। (বিস্তারিত পরবর্তী সংখ্যায়)। □

রাজ্য সরকারের অগণতান্ত্রিক ও কর্মচারী বিরোধী মনোভাবের প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন

গত ২০ মার্চ ২০১৮, কলকাতার প্রেস ক্লাবে কর্মচারীদের জরুরী দাবি দাওয়া সম্পর্কে রাজ্য সরকারের উদাসীনতা এবং রাজ্য প্রশাসনের অগণতান্ত্রিক কার্যপদ্ধতির বিরুদ্ধে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন সংগ্রামের বার্তা নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি সংগঠনের তিন নেতৃত্ব, যথাক্রমে (বাঁদিক থেকে) বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী (যুগ্ম সম্পাদক), বিজয় শংকর সিংহ (সাধারণ সম্পাদক) ও মানস দাস (অন্যতম সহ-সম্পাদক)। এ সংক্রান্ত রিপোর্ট পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পেট্রোল-ডিজেলের নজিরবিহীন মূল্যবৃদ্ধি

গত ৩১ মার্চ মধ্যরাত থেকে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য এক ধাপ বেড়ে তৈরি করলো নুতন নজির। রাজধানী দিল্লীতে ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি হয়ে দাঁড়ালো লিটার প্রতি ৬৪.৫৮ টাকা, মুম্বাইয়ে ৬৮.৭৭ টাকা, চেন্নাইয়ে ৬৮.১২ টাকা। ডিজেলের দাম সর্বকালের সর্বোচ্চ হয়ে গেল। পেট্রোলের দাম গত চার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছালো। দিল্লীতে ১ এপ্রিল, ২০১৮ থেকে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হয়েছে ৭৩.৭৩ টাকা। কলকাতায় ৭৬.৪৪ টাকা, মুম্বাইয়ে ৮১.৫৯ টাকা, চেন্নাইয়ে ৭৬.৪৮ টাকা। মোদী সরকারের আমলে পেট্রোপণ্যের দাম বেড়েই চলেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় বাড়ছে পরিবহণসহ সংশ্লিষ্ট অনেক ক্ষেত্রের ব্যয়। সামগ্রিক প্রভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য।

গত বছরের জুন থেকে তেল কোম্পানীগুলি প্রতিদিনই পেট্রোপণ্যের দাম নির্ধারণ করছে। ১ এপ্রিল পেট্রোল ও ডিজেলে লিটার প্রতি দাম বেড়েছে ১৮ থেকে ২৫ পয়সা।

দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতেই পেট্রোল-ডিজেলের দাম সবচেয়ে বেশি। পেট্রোপণ্যের দাম বৃদ্ধির অন্যতম কারণ পেট্রোপণ্যের ওপরে শুল্ক। দামের প্রায় অর্ধেকই কর। ২০১৪-র নভেম্বর থেকে ২০১৬-র জানুয়ারির মধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ৯ বার পেট্রোপণ্যের শুল্ক বাড়িয়েছিলেন। ফলে সেই সময় আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য হ্রাস হতে থাকলেও তার কোনো সুফল দেশবাসী পাননি। ওই ১৫ মাসে ৯ বারে পেট্রেলের ওপরে শুল্ক বেড়েছে ১১.৭৭ টাকা, ডিজেলের ওপর বেড়েছে ১৩.৪৭ টাকা।

কলকাতায় পেট্রোলের দাম মার্চ মাসে বেড়েছে ১.৯৪ টাকা। ডিজেলের দাম ১ মার্চ থেকে ৩১ মাচ বেড়েছে ২.১৫ টাকা। অশোধিত তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে যখন সর্বকালের সর্বোচ্চ দামের অর্ধেক, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির কারণে ভারতীয়রা ডিজেলে সর্বকালের সর্বোচ্চ দাম দিচ্ছেন। পেট্রোলের দামও চার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে দেশ জুড়ে। □

গ্রাহক সংগ্রহ কর্মসূচী

এপ্রিল-মে ২০১৮ মাস ব্যাপী সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহের কর্মসূচী সফল করুন। একই সাথে এমপ্লয়িজ ফোরাম পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহের কাজও দ্রুত সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করুন।—কেন্দ্রীয় কমিটি

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।